অপঘাত-মৃত্যু-নিবারণ।

অর্থাৎ

আকস্মিক বিপদ বা দুর্ঘটনা ও অপমৃত্যু প্রতিকারের সহজ উপায়।

"রোগশোকপরিতাপবন্ধনব্যসনানি চ।
আত্ম পরাধবৃক্ষানাং ফলান্যেতানি দেহিনাম্॥"

পাকপ্রণালী সম্পাদক
শ্রীবিপ্রদাস মুখোপাধ্যায় প্রণীত।

ও
৬১। জি, ক্যানিং ষ্ট্রীট (মুরগিহাটা) বেনার্জি এণ্ড মুখার্জি কোম্পানি, জেনারেল মার্চেণ্ট্স্ দ্বারা প্রকাশিত।

কলিকাতা।

১৫০ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, এম্প্রেস্ প্রেস্ হইতে
শ্রীগোপালচন্দ্র চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত।

মূল্য ।• আনা মাত্র।

অপঘাত-মৃত্যু-নিবারণ।

অর্থাৎ

আকস্মিক বিপদ বা দুর্ঘটনা ও অপমৃত্যু প্রতিকারের সহজ উপায়।

"রোগশোকপরিতাপবন্ধনব্যসনানি চ।
আত্মাপরাধবৃক্ষানাং ফলান্যেতানি দেহিনাম্॥"

পাকপ্রণালী সম্পাদক
শ্রীবিপ্রদাস মুখোপাধ্যায় প্রণীত।

ও
৭১। জি, ক্যানিং ষ্ট্রীট (মুরগিহাটা) বেনার্জি এণ্ড মুখার্জি কোম্পানি, জেনারেল মার্চেণ্টস্ দ্বারা প্রকাশিত।

কলিকাতা।
১৫৩ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, এম্প্রেস্ প্রেস্ হইতে
শ্রীগোপালচন্দ্র চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত।

বিজ্ঞাপন।

আজি কালি দেশমধ্যে গ্রন্থকর্ত্তার অভাব নাই। আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে নিত্য রাশি রাশি নূতন নূতন পুস্তক উপস্থিত হইতেছে; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই প্রকৃত উপকার-জনক পুস্তক প্রণয়নে অনেকেই উদাসীন। যে সকল পুস্তক পাঠে বাস্তবিক মানবজীবনের উপকার হইতে পারে এরূপ প্রয়োজনীয় পুস্তকাদি প্রকাশে কাহারও চেষ্টা দেখা যায় না। নাটক নভেল প্লাবিত দেশে প্রকৃত উপকার-জনক পুস্তকের আদর হইবে কি না বলিতে পারি না। যাহা হউক এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি দ্বারা যদি জন সমাজের অণুমাত্র উপকার হয়, তবে সমুদয় পরিশ্রম এবং গ্রন্থপ্রণয়ন-বাসনা সফল জ্ঞান করিব।

শ্রীবিপ্রদাস মুখোপাধ্যায়।

সূচী।

অপঘাত-মৃত্যু-
নিবারণ।

দুর্ঘটনা।

মনুষ্য যত কেন সতর্ক বা সাবধান হউন না, কিন্তু কখন্ যে কাহার ভাগ্যে কিরূপ বিপদ ঘটিবে, তাহার কিছুমাত্র স্থিরতা নাই। বিপদ-সঙ্কুল সংসারে সর্ব্বদা নানা প্রকার বিপদ উপস্থিত হইয়া থাকে। আমরা বিপদ সাগরে নিমগ্ন রহিয়াছি; পদে পদে আমাদিগকে বিপদের সহিত সংগ্রাম করিতে হয়। সুতরাং কখন্ যে কাহার অদৃষ্টে কিরূপ বিপদ ঘটিবে, তাহা কে বলিতে পারে? ফলতঃ যে কোন প্রকার বিপদই উপস্থিত হউক না কেন, তাহাতে অভিভূত হওয়া উচিত নহে। বিপদ-কালে ধৈর্য্য ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব অবলম্বন করা একান্ত আবশ্যক। বিপদে অধৈর্য্য ও অভিভূত হইলে, বিপদ হইতে উদ্ধার হওয়া দূরে থাকুক, প্রত্যুতঃ বিপদ আরও ভয়ানক আকারে উপস্থিত হইয়া থাকে। অতএব যে কোন প্রকার বিপদ কিম্বা দুর্ঘটনা উপস্থিত হইলে তাহাতে বিচেতন হওয়া কখনই কর্ত্তব্য নহে।

কতকগুলি দুর্ঘটনা এরূপ আকারে উপস্থিত হইয়া থাকে যে, তাহা হইতে মুক্তি লাভ করা সুকঠিন। এজন্য পূর্ব্ব হইতেই ভাবী দুর্ঘটনা নিবারণের উপায় স্থির করিয়া রাখা উচিত। অনেক সময় দেখা যায়, অসাবধানতা বশতঃ নানা প্রকার দুর্ঘটনা ঘটিয়া থাকে। যদিও ছায়ার ন্যায় দুর্ঘটনা আমাদের সঙ্গে সঙ্গে বিচরণ করিতেছে, কিন্তু সাবধানতা অবলম্বন করিলে যে, অনেক প্রকার দুর্ঘটনার প্রতিকার করা যায়, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

মনুষ্যের পদে পদে বিপদ; এজন্য সচরাচর যে সকল বিপদ বা দুর্ঘটনা ঘটিবার সম্ভব, তৎসমুদায় নিবারণের ব্যবস্থা করিয়া রাখা কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ গৃহস্থ গৃহে সর্ব্বদাই দুর্ঘটনা ঘটিবার সম্ভব। কখন কখন এরূপও দেখা যায়, ব্যক্তি বিশেষের নির্ব্বুদ্ধিতাদোষে দুর্ঘটনা ভয়ানক আকারে উপস্থিত হইয়া, শেষে সমুদায় পরিবারমণ্ডলীকে বিপদ-গ্রস্ত করিয়া তুলে। কিন্তু পূর্ব্ব হইতে যদি সাবধানতা বা সতর্কতা অবলম্বন করা যায়, তবে অনেকাংশে উহার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার সম্ভব। ফলতঃ সাবধানতাই বিপদ নিবারণের একমাত্র অমোঘ উপায়।

বিপদ বা দুর্ঘটনায় উপেক্ষা প্রদর্শন করা মূঢ়ের কার্য্য। কারণ, কোন প্রকার দুর্ঘটনাকেই বিশ্বাস করা উচিত নহে। যে বিপদ বা দুর্ঘটনা প্রথমে সামান্য বোধ হয়, তাহাই আবার শেষে ভয়ানক আকারে উপস্থিত হইতে পারে। এজন্য প্রথমা-

বস্থা হইতেই সতর্ক হওয়া কর্ত্তব্য। এই সামান্য সতর্কতার অভাবে সময় সময় মহা অনর্থ ঘটিতেও দেখা যায়। এজন্য বিপদমাত্রেই উপেক্ষা করা উচিত নহে। কখন যে, কোন্ বিপদ বা দুর্ঘটনা কিরূপ আকারে উপস্থিত হইবে, তাহার যখন কিছুমাত্র স্থিরতা নাই, তখন ভাবী বিপদাদি নিবারণ নিমিত্ত প্রস্তুত থাকা কর্ত্তব্য।

অজ্ঞতাবশতঃ অনেকে আবার বিপদ বা দুর্ঘটনা সমূহকে ডাকিয়া আনিয়া থাকেন। কেহ কেহ আবার দৈবের উপর নির্ভর করিয়া বিপদ নিবারণের চেষ্টা করেন না। অবশেষে সেই বিপদ এরূপ ভীষণ আকারে উপস্থিত হয় যে, তদ্দ্বারা সমুদায় পরিবারবর্গ বিব্রত হইয়া উঠে। কেবলমাত্র যে বিব্রত হয় তাহাও নহে, সেই ঘোরতর মূর্খতাবশতঃ কখন কখন ইহ-জীবনের সুখ চিরকালের জন্য অস্তগত হইয়াও থাকে।

কোন কোন প্রকার বিপদ হইতে মুক্তি-লাভ করিতে হইলে চিকিৎসকের সাহায্য প্রয়োজন হইয়া থাকে। কিন্তু এরূপ হইতেও দেখা যায়, যে কোন কোন বিপদে চিকিৎসক আনয়ন করিতে সময় পাওয়া যায় না। এরূপ স্থলে সেই সকল বিপদ হইতে মুক্তি-লাভ করিবার উপায় শিক্ষা করা প্রত্যেক গৃহস্থের পক্ষে যে, গুরুতর প্রয়োজন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

মানব-জাতি যতই কেন সাবধান বা সতর্ক হউন না, কিন্তু কখন যে কোন প্রকার দুর্ঘটনায় পড়িবেন না, এ কথা কেহ

বলিতে পারেন না। অতএব বিপদে পড়িয়া হতচেতন হওয়া অপেক্ষা পূর্ব্ব হইতেই বিপদ প্রতিবিধানের চেষ্টা করিয়া রাখা দূরদর্শীর কার্য্য। কতকগুলি বিপদ আছে সহস্র চেষ্টা করিলেও তাহা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারা যায় না। যে সকল বিপদ নিবারণ মানব-বুদ্ধির অসাধ্য তদ্বিষয়ে ক্ষোভ ও দুঃখ করা বৃথা। কিন্তু যাহা সামান্য সতর্কতার ত্রুটিবশতঃ ঘটিয়া থাকে, তাহাতে উদাসীন থাকা যার-পর-নাই পরিতাপের বিষয়।

আত্মহত্যা।

জন্ম হইলেই মৃত্যু হয়, ইহা প্রকৃতির অবশ্যম্ভাবী নিয়ম। কাল পূর্ণ হইলেই প্রাণিগণ ইহসংসার পরিত্যাগ করিয়া থাকে। মৃত্যুর হস্ত হইতে কেহই মুক্তি লাভ করিতে সমর্থ নহে। মৃত্যুকে আহ্বান করিতে হয় না ; ছায়ার ন্যায় মৃত্যু প্রাণিগণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ বিচরণ করিতেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, কোন কোন নির্ব্বোধ লোক অসময়ে মৃত্যুর সহিত আলিঙ্গন করিয়া ইহসংসার পরিত্যাগ করিয়া থাকে।

আত্মহত্যা যে মহাপাপ এ কথা কাহাকেও যুক্তি দ্বারা বুঝাইতে হয় না। আত্মহত্যা করিতে হইলে বলপূর্ব্বক প্রাণ-পাখীকে দেহ-পিঞ্জর হইতে বাহির করিতে হয়। স্বাভাবিক মৃত্যু অপেক্ষা আত্মহত্যায় ভয়ানক ক্লেশ। স্বাভাবিক মৃত্যুতে

ক্রমে ক্রমে শরীর দুর্ব্বল হইতে থাকে, ইন্দ্রিয়াদি অবসন্ন হইয়া আইসে, শরীর ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে থাকে, পরিশেষে সেই অবসন্ন দেহে মহানিদ্রা আশ্রয় করিয়া জীবদিগকে পার্থিব সুখ দুঃখ হইতে চিরকালের জন্য বিচ্ছিন্ন করিয়া থাকে।

সচরাচর দেখা যায়, রোগ যন্ত্রণা, লোক-লজ্জা এবং ক্রোধাদির বশবর্ত্তী হইয়া নির্ব্বোধ লোক আত্মহত্যা করিয়া থাকে। আত্ম-হত্যা যে মহাপাপ ইহা স্মরণ থাকিলে এই ঘোরতর মহাপাপে কেহ লিপ্ত হয় না। গণনা দ্বারা সপ্রমাণ হইয়াছে, যে সকল হতভাগ্য লোক আত্মহত্যা করিয়া থাকে, তন্মধ্যে সামান্য বুদ্ধির লোকই অধিক। এদেশে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকেরাই সামান্য কারণে অসহিষ্ণু হইয়া আত্মহত্যা করিয়া থাকে। সংসারে থাকিতে হইলে নানা কারণে হৃদয়ে আঘাত সহ্য করিতে হয়। তাই বলিয়া অমূল্য জীবন বিসর্জ্জন দেওয়া কখনই কর্ত্তব্য নহে। নৌকা-পথে ভ্রমণ করিতে হইলে সময় সময় ঝটিকায় পড়িতে হয়, কিন্তু তাই বলিয়া কে কবে নৌকা জলমগ্ন করিয়া দিয়া ঝটিকার হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া থাকে?

নানা উপায়ে লোকে আত্মহত্যা করিয়া থাকে। যে কোন উপায়েই হউক না কেন আত্মহত্যা একটী মহা-পাপ মধ্যে পরিগণিত। এই মহাপাপ যাহাতে অন্তঃকরণে আশ্রয় করিতে না পারে, তাহার চেষ্টা পাওয়া উচিত। আত্মহত্যা প্রবৃত্তি জন্মিলে মনুষ্যের বুদ্ধি ভ্রংশ হইয়া থাকে, হিতাহিত বিবেচনা শক্তি থাকে না। কি উপায়ে জীবন নষ্ট করিবে সেই চিন্তাই

বলবতী হইয়া উঠে। প্রাণের প্রতি মমতা থাকে না, সংসার উদাস জ্ঞান হয়, এজন্য এই দুষ্প্রবৃত্তি মনে উদয় হইলেই নীতি-পূর্ণ গ্রন্থাদি পাঠ, সৎসঙ্গ এবং শাস্ত্র আলোচনায় মনো-নিবেশ করা কর্ত্তব্য।

অগ্নিপ্রবেশ, জলপ্রবেশ, উদ্বন্ধন এবং বিষ-পান প্রভৃতি দ্বারাই যে আত্মহত্যা সাধিত হইয়া থাকে এরূপ নহে। স্বাস্থ্যের প্রতি অবহেলা দ্বারা ক্রমে ক্রমে রোগ ভোগ করিয়া মৃত্যু-মুখে পতিত হওয়াও এক প্রকার আত্মহত্যা; তবে প্রভেদের মধ্যে শীঘ্র এবং বিলম্বে মৃত্যুর সহিত আলিঙ্গন করা।

যে সকল হতভাগ্য নরনারী আত্মহত্যা করিয়া থাকে, আত্মহত্যায় যে, কিরূপ ভয়ানক যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় তাহা তাহারা অগ্রে বিবেচনা করে না। তখন তাহারা এক প্রকার উন্মত্ত হইয়া উঠে। উন্মত্ত ব্যক্তির অনুষ্ঠিত কার্য্য কখনই ধর্ম্ম-বুদ্ধির অনুমোদিত নহে।

অগ্নি-দাহ বা আগুণে পোড়া।

যত প্রকার বিপদ আছে, তন্মধ্যে অগ্নি-দাহ যে একটী প্রধান বিপদ, তাহা কে না মুক্ত-কণ্ঠে স্বীকার করিবেন ? অন্য কোন প্রকার বিপদ উপস্থিত হইলে তাহা নিবারণ চেষ্টা করিতে সময় পাওয়া যায়, কিন্তু এই বিপদ এরূপ ভয়ানক যে, কাহারও সাহায্য লইবার অবসর লাভ ঘটিয়া উঠে না; বরং সাহায্য লাভের চেষ্টা করিতে যে সময় প্রতীক্ষা করিতে হয়, সেই সময় মধ্যে বিপদ আরও ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া থাকে। এজন্য কাহারও বস্ত্রাদিতে আগুণ লাগিলে, সে সময় অন্যের সাহায্য লইবার জন্য ছুটিয়া যাওয়া কিম্বা অপেক্ষা না করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহা নিবারণের চেষ্টা করাই সৎপরামর্শ। পরিধান-বস্ত্রাদিতে আগুণ লাগিলে যদি সেখানে কম্বল, সতরঞ্চ এবং লেপ, কাঁথা প্রভৃতি কোন মোটা জিনিষ থাকে, তবে তৎক্ষণাৎ তাহার মধ্যে যে কোন জিনিষ গায়ে জড়াইয়া মাটিতে গড়াইলে আগুণ নিবিয়া যায়। ঐ সকলের অভাব হইলে অমনি মাটিতে গড়াইলেও শরীরের চাপে অগ্নি নির্ব্বাণ হইতে পারে; এবং কাহারও সাহায্য লইতে হইলে এইরূপে গড়াইতে গড়াইতে চীৎকার করিয়া লোক ডাকা সৎপরামর্শ। জামা প্রভৃতি আঁটাকাপড় হইলে হয় ছিঁড়িয়া না হয় পূর্ব্ববৎ ভূমিতে গড়াগড়ি দেওয়াই বুদ্ধির কাজ। আর নিকটে যদি জল থাকে, তবে তদ্দ্বারা নির্ব্বাণের চেষ্টা পাওয়াও মন্দ নহে।

অগ্নি-দাহ এরূপ ভয়ানক বিপদ যে, পোড়ার অবস্থায় এক মুহূর্ত্তও সময় নষ্ট হইতে দেওয়া উচিত নহে। কারণ ঐ অল্প সময় মধ্যেই গুরুতর বিপদ হইয়া উঠে। অসাবধানতা বশতঃই যে, অধিকাংশ স্থলে এই বিপদ ঘটিয়া থাকে, তাহা বোধ হয়, অনেকেই স্বীকার করিবেন। আমরা সরকারী বিজ্ঞাপনীতে দেখিতে পাইয়া থাকি, এদেশে শীতকালে অধিকাংশ শিশু আগুণে পুড়িয়া মৃত্যু-মুখে পতিত হইয়া থাকে। অতএব শীতকালে যেমন সর্ব্বদা শিশুগণ গাত্র-বস্ত্র দ্বারা জড়িত থাকে, সেই সঙ্গে গৃহ মধ্যে এরূপ নিয়মে আগুণ রাখা উচিত, তদ্দ্বারা যেন কোন প্রকার বিপদ আক্রমণ করিতে না পারে।

সচরাচর দেখা যায়, দুই প্রকার নিয়মে আমাদের শরীর পুড়িয়া থাকে। অর্থাৎ গরম জল, দুগ্ধ প্রভৃতি গরম দ্রব্যের স্পর্শ বা আঁচে এবং আগুণ লাগিয়া ; এই উভয় প্রকার দাহের মধ্যে আগুণে পোড়াই নিতান্ত সাংঘাতিক। কিন্তু আগুণে পুড়িলেই যে, সকল স্থলে তাহা সাংঘাতিক হয় তাহা মনে করা উচিত নহে। আগুণে পোড়া প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত। তন্মধ্যে প্রথম অবস্থা বা প্রথম প্রকারের পোড়ায় চর্ম্মের উপর অল্পমাত্র আঁচ লাগিয়া উহা লাল হইয়া উঠে ; তদ্দ্বারা ফোস্কা হয় না এবং কোন প্রকার বিপদেরও আশঙ্কা থাকে না, সামান্য জ্বালা হইয়া নিবারিত হইয়া থাকে। দ্বিতীয় অবস্থায় বা দ্বিতীয় প্রকারে উহার যন্ত্রণা অধিক হয় এবং দগ্ধ স্থানে ফোস্কা হইয়া উঠে। তৃতীয় অবস্থায় বা তৃতীয় প্রকারে, দগ্ধ স্থান তলতলে হয় এবং

কখন কখন তৎক্ষণাৎ সেই স্থানের মাংস উঠিয়া ভয়ানক দৃশ্য উপস্থিত করে, কখন কখন আবার দগ্ধের অল্পক্ষণ পরেও মাংস খসিয়া পড়িয়া থাকে। এইরূপ পোড়াই ভয়ের বিষয়। যে পোড়াতে ফোস্কা উঠে অর্থাৎ দ্বিতীয় প্রকার পোড়াতে যন্ত্রণা অধিক কিন্তু বিপদের আশঙ্কা অল্প। তৃতীয় অবস্থার পোড়া যদিও ভয়ানক,কিন্তু শরীরের সকল স্থানে উহা সাংঘাতিক নহে। হস্ত-পদাদি পুড়িলে তত ভয়ানক নহে, কিন্তু গলা হইতে কটিদেশ অর্থাৎ কোমর পর্য্যন্ত তৃতীয় প্রকার পোড়ার যার-পর-নাই ভয়ের বিষয়। আবার কোন কোন স্থলে দেখা যায় যে, অধিক স্থান ব্যাপিয়া পোড়া অপেক্ষা অল্প স্থানে যদি গভীর গর্ত্ত হইয়া দগ্ধ হয়, তবে তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা আশঙ্কার বিষয়।

যে কোন অবস্থায় পোড়ার চিকিৎসা সম্বন্ধে একটী বিষয়ের প্রতি বিশেষ মনোযোগ রাখিতে হয়, অর্থাৎ দগ্ধ স্থানে যেন বাতাস লাগিতে না পায়, তাহার উপায় করাই প্রধান চিকিৎসা। কিরূপ উপায় অবলম্বন করিলে পোড়ার সুচিকিৎসা হইতে পারে, এস্থলে তাহার স্থূল স্থূল বৃত্তান্ত লিখিত হইতেছে।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, প্রথম প্রকারের পোড়া তত ভয়ানক নহে; কিন্তু তাই বলিয়া চিকিৎসায় তাচ্ছিল্য করা অকর্ত্তব্য। পোড়া স্থানের উপর আস্তে আস্তে ময়দা ছড়াইয়া দেওয়া আবশ্যক। কেহ কেহ আবার পিজা তুলাতে ময়দা মাখাইয়াও তাহার উপর দিয়া থাকেন। ফলতঃ যাহাতে ঐ স্থানে বাতাস লাগিতে না পায়, তাহার ব্যবস্থা করাই

উচিত। এই পোড়াতে কখন কখন দগ্ধ স্থানের ছাল উঠিয়া যায়, আবার কোন কোন স্থলে আদৌ ছাল উঠে না, অল্পমাত্র লাল হইয়া থাকে। যে কোন পোড়ার অবস্থায় জ্বর হইলে বিজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শানুসারে চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য এবং আবশ্যক বুঝিয়া মৃদু বিরেচক জোলাপ দিলে ভাল হয়।

দ্বিতীয় অবস্থার পোড়া যে, অপেক্ষাকৃত কঠিন, তাহা বোধ হয় সকলেই বুঝিতে পারিয়াছেন। এজন্য বিশেষ সতর্কতার সহিত চিকিৎসায় মন দিতে হয়। দগ্ধ স্থানের উপর বস্ত্রাদি কোন পদার্থ লাগিয়া থাকিলে অতি সাবধানে তাহা যত শীঘ্র পারা যায় তুলিয়া ফেলা উচিত। উহা এরূপ সাবধানতার সহিত তুলিতে হইবে, ফোস্কা যেন কোন ক্রমে গলিয়া না যায়। কারণ ফোস্কার চামড়া দ্বারা ভিতরের ক্ষত যেরূপ আচ্ছাদিত থাকে, অন্য কোন পদার্থ দ্বারা সেরূপ আচ্ছাদিত হয় না। এজন্য ফোস্কার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হয়। যদি ফোস্কা গালা আবশ্যক বোধ হয়, তাহা হইলে উহার উপরে ছিদ্রাদি না করিয়া নিম্নে সূচী কিম্বা সূক্ষ্ম ছুরীর অগ্রভাগ দ্বারা ছিদ্র করিয়া জল বাহির করিলে চলিতে পারে। সমভাগ চুণের জল ও মসিনা তদভাবে নারিকেল তৈল একত্র ফেণাইয়া, তদ্দ্বারা এক খণ্ড নেকড়া ভিজাইয়া দগ্ধ স্থানে দেওয়া উচিত এবং উহা শুষ্ক হইলে তাহার উপর ঐ তৈল মিশ্রিত জল মধ্যে মধ্যে দেওয়া আবশ্যক। তিন চারি ঘণ্টা পর্য্যন্ত দগ্ধ

স্থান শীতল জলে ডুবাইয়া রাখিলে অথবা উহার পটি দিলেও জ্বালা নিবারিত হইয়া থাকে। তিসির তৈলের পুল্টিস্ দ্বারাও বিশেষ উপকার হইতে দেখা যায়। পরে তাহার উপর শুকা মলম বা মাখম দিয়া রাখিবে। কারণ ক্ষত শুষ্ক হইতে আরম্ভ হইলে তাহা অত্যন্ত চড় চড় করিতে থাকে।

যে স্থান পুড়িবে তাহা যতদূর বিস্তার করিয়া রাখিতে পারা যায়, তাহার ব্যবস্থা করা আবশ্যক। বিশেষতঃ সন্ধি-স্থল মাত্রেই সোজা করিয়া না রাখিলে ক্ষত শুষ্ক হইলে ঐ স্থানের চর্ম্ম সঙ্কুচিত হইয়া জোড়া লাগিয়া কিম্বা বক্রভাবে থাকিয়া যাইবার গুরুতর সম্ভব।

তৃতীয় অবস্থার পোড়ার চিকিৎসায় প্রায়ই সুচিকিৎসক ভিন্ন শান্তি লাভের উপায় নাই। তবে চিকিৎসক আনয়ন করিতে যে সময় লাগিবে, সেই সময়টুকু যেন বৃথা নষ্ট না হয়; এজন্য যে সকল নিয়মে চিকিৎসা করিতে হইবে, এক্ষণে তাহার বিষয় উল্লিখিত হইতেছে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, পোড়ার অবস্থা হইতে এক মুহূর্ত্তও বৃথা সময় নষ্ট না হয়, কারণ ঐ সময়ের মধ্যেই প্রভূত অপকার হইতে পারে।

এই ভয়ানক পোড়াতে রোগীকে প্রথমেই চীৎ করাইয়া শয়ন করাইতে হইবে এবং বিছানা গরম রাখিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। কারণ উহাতে প্রায়ই কম্প উপস্থিত হইয়া থাকে; এজন্য গরম জল-পূর্ণ বোতল রোগীর দেহের নিকট স্থাপন করা আবশ্যক। গরম জলে তার্পিণ তৈলের ছিটা দিয়া

সেই জলে ফ্লানেল কাপড় ভিজাইয়া ফোমেণ্ট অর্থাৎ সেক করিতে হইবে। অল্প স্থান দগ্ধ হইলে শীতল জলে ভিজাইয়া রাখিলে চলিতে পারে। কিন্তু উহা অধিক স্থান ব্যাপিয়া হইলে তুলি করিয়া তার্পিণ তৈল পোড়া স্থানে লেপিয়া দেওয়া ভাল। পরে তাহাতে সমভাগ তার্পিণ ও মসিনা তৈল মাখাইতে হইবে। অনন্তর কেবলমাত্র মসিনা তৈল মাখাইয়া তাহার উপর তুলা লাগাইয়া সেইরূপ অবস্থায় তিন চারি দিন রাখিয়া পরে তুলিয়া ফেলিবে। তুলা তুলিলে প্রায়ই ক্ষত শুষ্ক দেখা যাইবে।

দগ্ধ স্থানে যে সকল ঔষধ দিতে হইবে, তাহা প্রত্যেক গৃহস্থেরই জানিয়া রাখা অতীব আবশ্যক। এই আবশ্যকীয় ঔষধ সমূহের স্থূল স্থূল বিবরণ এস্থলে লিখিত হইল।

(১) চূণের জল ও মসিনা তৈল ফেণাইয়া দিতে হইবে।

(২) গ্লিসিরিণ তৈল* পালকে করিয়া দগ্ধ স্থানে দিতে হইবে।

(৩) গোলআলু কুরিয়া তাহার মধ্যস্থ শাঁসের পুল্টিস্ লাগাইবে।

(৪) দগ্ধ স্থানে ময়দা ছড়াইয়া দিবে।

(৫) দগ্ধ স্থানে গঁদের জল দেওয়া ভাল। তাহাতে যদি চড়্ চড়্ করিতে থাকে, তবে তাহাতে গ্লিসিরিণ দিবে।

(৬) একটী বড় পিয়াজ ও গোলআলু বাটিয়া তাহাতে

---

* ডাক্তারখানায় পাওয়া যায়।

এক পলা সুইট বা নারিকেল তৈল মিশাইয়া পুরু ভাবে প্রলেপ দিবে। এই প্রলেপের উপর একখানি নেক্‌ড়া বাঁধিয়া ক্ষত স্থান ঢাকিয়া রাখিবে।

(৭) ক্ষত স্থানে ছাল উঠিয়া গেলে ভিনিগার ও জল এক সঙ্গে মিশাইয়া গরম করিয়া লাগাইতে হইবে। উহার অভাবে সমভাগ চূণের জল ও সুইট অয়েল ফেণাইয়া দিতে পারা যায়। এই সকলের অভাবে তার্পিণ তৈল দিলেও চলিতে পারে।

(৮) শীতল জলে ঘনভাবে সাবান গুলিয়া পাতলা নেক্‌ড়ার উহা মাখাইয়া দগ্ধ স্থানে দিতে পারা যায়। শুষ্ক হইলে পুনর্ব্বার ঐ নেক্‌ড়ার উপর সাবান জল দিতে হইবে। আচ্ছাদনের নেকড়া যেন তুলিয়া ফেলা না হয়।

(৯) নারিকেল তৈল ও মোম এক সঙ্গে গলাইয়া যে মলম প্রস্তুত হইবে, ঐ মলম নেকড়ায় মাখাইয়া ক্ষত বা দগ্ধ স্থানে দিতে হইবে এবং মধ্যে মধ্যে তাহা শীতল জল দ্বারা ভিজাইয়া রাখিতে হইবে।

(১০) ফুলখড়ি, সুইট অয়েলে (অভাবে জলে) গুলিয়া দগ্ধ স্থানের চারিধারের কতক উপরে পুরুভাবে প্রলেপ দিতে হইবে। ইহা ব্যবহার করিলে তৎক্ষণাৎ জ্বালা নিবারিত হইবে। শুষ্ক না হয় এজন্য সর্ব্বদা উহা ভিজা রাখিতে হইবে এবং রাত্রিকালে একখণ্ড ফ্লানেল দ্বারা উহা জড়াইয়া রাখিলে শুষ্ক হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না।

(১১) দগ্ধস্থানে ঝোলা গুড় লেপিয়া দিলেও উপকার হইয়া থাকে।

(১২) আঙুল পুড়িলে ফাক ফাক করিয়া রাখিতে হইবে এবং সন্ধি-স্থল পুড়িলে বাড় বাঁধিয়া রাখা আবশ্যক। নতুবা জোড়া লাগিয়া যাইবার বিশেষ সম্ভব।

গরম দ্রব্য দ্বারা গলার ভিতর পুড়িয়া গেলে শীতল জল কিম্বা বরফ সেবন করিলে উপকার হইতে পারে।

যে পোড়া, চামড়া হইতে হাড় পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় তাহাতে মাথায় রক্ত উঠে এবং পরিশেষে মৃত্যু পর্য্যন্তও ঘটিয়া থাকে। বালকদিগের এরূপ পোড়ায় প্রথমে কম্প উপস্থিত হয়, কম্প অন্তে শরীর শীতল হইয়া সর্ব্ব-সন্তাপ-নাশী মৃত্যু উপস্থিত হয় ও তাহাদিগকে সকল যন্ত্রণার হাত হইতে পরিত্রাণ করিয়া থাকে।

পোড়াতে ধনুষ্টঙ্কার রোগ উপস্থিত হইতে দেখা যায়। এজন্য সুচিকিৎসক দ্বারা চিকিৎসা করাইতে অবহেলা করা উচিত নহে।

যে কোন প্রকারের কঠিন পোড়াতে, কোষ্ঠ পরিষ্কার রাখিবার জন্য মৃদু বিরেচক দ্রব্য সেবন করিতে দেওয়া উচিত।

আগুণে পোড়া যেরূপ ভয়ানক বিপদ পুনঃ পুনঃ তাহা উল্লেখ করিয়া কাহাকেও বুঝাইয়া দিতে হয় না। আগুণে-পোড়ার পর সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করা অপেক্ষা যাহাতে এই বিপদ আক্রমণ করিতে না পারে, তদ্বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন

করাই সুপরামর্শ। বাস্তবিক একটু সতর্ক থাকিলে এই বিপদের হাত হইতে যে, মুক্তি লাভ করিতে পারা যায়, তাহা যদিও সম্পূর্ণ সত্য, কিন্তু কোন কোন সময় এই দুর্ঘটনা এরূপ আকস্মিক-ভাবে উপস্থিত হয় যে, তৎকালে প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ভিন্ন বিপদ হইতে মুক্তি লাভের আর কোন প্রকার আশাই থাকে না। সে যাহা হউক এই বিপদ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য প্রত্যেক গৃহস্থেরই যেরূপ পূর্ব্ব-সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত, এক্ষণে তৎসম্বন্ধে কতিপয় স্থূল স্থূল বৃত্তান্ত উল্লেখ করা যাইতেছে।

আমরা সচরাচর দেখিতে পাইয়া থাকি, শীতকাল হইতে আরম্ভ হইয়া গ্রীষ্মকালের মধ্যেই অধিক পরিমাণে অগ্নি-দাহ ঘটিয়া থাকে। এজন্য এই সময় বিশেষরূপ সাবধান হওয়া আবশ্যক। গৃহের অগ্নি ভালরূপ নির্ব্বাণ করিয়া শয়ন করা উচিত; কেননা অনেক স্থলে এরূপও দেখা গিয়াছে, গৃহস্থগণ ভাল করিয়া অগ্নি নির্ব্বাণ না করিবা গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছেন কিম্বা শয়ন করিয়াছেন, পরে সেই নির্ব্বাণ-প্রায় অগ্নি হইতে সামান্য স্ফুলিঙ্গ ধিকি ধিকি প্রজ্বলিত হইয়া বিস্তর অনর্থ ঘটাইয়া তুলিয়াছে। আগুণের নিকট বস্ত্রাদি রাখার দোষেও অনেক সময় তাহাতে আগুণ লাগিয়া গৃহাদি দগ্ধ হইয়া থাকে। কোন কোন স্থলে বিছানায় মশারি খাটাইয়া তন্মধ্যে প্রদীপ রাখিয়া লিখন পঠন করাতেও এই বিপদ উপস্থিত হইতে দেখা যায়। রাত্রিকালে বিছানার নিকট কথনই প্রদীপ রাখা উচিত নহে; কারণ অনেক সময় এরূপও দেখা যায় যে, বাতাসে মশারি

প্রভৃতি প্রদীপের উপর উড়িয়া পড়াতেও ভয়ানক ব্যাপার ঘটিয়া উঠে। রাত্রিকালে আল্‌নার নিকট অথবা বস্ত্রাদির বাক্স খুলিবার সময় প্রদীপ প্রভৃতির আগুনেও কখন কখন নানা প্রকার বিপদ হইতে দেখা যায়। বাতি, গ্যাস প্রভৃতি ধরাইবার সময় কখন কখন এরূপও দেখা গিয়াছে যে, কাগজ অথবা অন্য কোন দ্রব্য দ্বারা ঐ সকল জ্বালিয়া পরে সেই আগুন ছুড়িয়া ফেলাতে অন্য পদার্থে তাহা ধরিয়া শেষে ভয়ানক ঘটনা উপস্থিত হইয়াছে। তামাক খাওয়ার পর আগুন সমেত কলিকা রাখার দোষেও বিপদ ঘটিয়া থাকে। কখন কখন এরূপও দেখা গিয়াছে যে, উনানের উপর কাষ্ঠাদি উচা অর্থাৎ শুকাইতে দিয়া সকলে নিশ্চিন্ত থাকেন, পরে কোন প্রকার ঘটনাবশতঃ ঐ কাষ্ঠে আগুন লাগিয়া অবশেষে গৃহাদি দগ্ধ হইয়া গৃহস্থগণ সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পড়েন। কেবল যে, তাঁহাদিগেরই সর্ব্বনাশ হইয়া থাকে, এরূপও নহে, সেই অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া অবশেষে প্রতিবাসীগণেরও যথাসর্ব্বস্ব ভস্মীভূত হইয়া যায়। শীত-বস্ত্র এবং পোশাকাদি পরিধান করিয়া আগুনের নিকট অতি সাবধানে যাতায়াত করা উচিত। বালকবালিকাদিগকে দেশলাই কিম্বা অন্য কোন আগুনের জিনিষ লইয়া ক্রীড়া করিতে দেওয়া সর্ব্বতোভাবে অন্যায়; বাজি পুড়াইবার দোষেও বিস্তর বিপদ ঘটিয়া থাকে।

অগ্নির আক্রমণ হইতে পরিত্রাণ লাভের জন্য (অর্থাৎ গৃহ ও অট্টালিকাদিতে আগুন লাগিলে) অনেক সময় দেখা যায়,

সামান্য এক একটী দ্রব্যের অভাবে শেষে ভয়ানক ব্যাপার উপস্থিত হইয়া থাকে। এজন্য প্রত্যেক গৃহস্থঘরে এক একখানি সিঁড়ি বা মই রাখা আবশ্যক। যাঁহারা অট্টালিকায় বাস করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের শয়ন গৃহে আধ ইঞ্চি কিম্বা সিকি ইঞ্চি মোটা এবং একফুট অন্তর অন্তর এক একটী গাঁইট থাকে, এরূপ এক এক গাছি দড়ী দ্বিতল, ত্রিতল গৃহের গরাদেতে বাঁধিয়া রাখা উচিত। হটাৎ অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া নিম্নে নামিয়া আসিবার অসুবিধা হইলে উক্ত দড়ী অবলম্বন করিয়া নামিলে অগ্নি-দাহের বিপদ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারা যায়। স্ত্রীলোক ও বালকবালিকা হইলে একে একে বাঁধিয়া নামাইয়া দিতে পারা যায়। দড়ীর অভাবে গৃহস্থিত বস্ত্রাদি সংযোগেও মুক্তি-লাভ হইতে পারে। যে স্থলে সে সুবিধাও ঘটিয়া উঠে না, তথায় উপর হইতে লম্ফ দিয়া পড়াই ব্যবস্থা। কিন্তু লাফ দিয়া পড়াতে একটী বিপদের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইতে গিয়া আর একটী বিপদের ক্রোড়ে আশ্রয় লওয়া হয়। অর্থাৎ অধিক উচ্চ হইতে পতিত হইলে হস্তপদাদি ভাঙ্গিয়া এমন কি জীবন পর্য্যন্তও নষ্ট হইবার আশঙ্কা থাকে। এজন্য প্রথমে লাফ দিয়া না পড়িয়া গৃহ মধ্যে লেপ, তোসক প্রভৃতি যে সকল দ্রব্য থাকে, তৎসমুদায় গৃহের নিম্নে ফেলিয়া দিয়া গরাদে প্রভৃতি আশ্রয় অবলম্বন করতঃ সরলভাবে ঝুলিতে হইবে, অবশেষে হাত ছাড়িয়া দিয়া পূর্ব্বপাতিত লেপের উপর পড়িলে ততটা বিপদের আশঙ্কা থাকে না।

অগ্নিদাহ উপস্থিত হইলে চঞ্চল না হইয়া স্থিরভাবে উপস্থিত বিপদ হইতে রক্ষা পাইবার উপায় করাই কর্ত্তব্য। কারণ আমরা অনেক সময় দেখিয়াছি, ঐরূপ ব্যস্ততার জন্য বিপদ আরও ভয়ঙ্কররূপে উপস্থিত হইয়া লোকের সর্ব্বনাশ করিয়া তুলিতে ত্রুটি করে না। অগ্নি-দাহকালে যে সকল উপায় অবলম্বন করিলে মুক্তি-লাভ করিতে পারা যায় অর্থাৎ অগ্নি-নির্ব্বাণ ও জীবনরক্ষা সম্বন্ধে যাহা যাহা প্রয়োজনীয়, সেই সকল বিষয় উল্লিখিত হইতেছে।

অট্টালিকাদিতে আগুণ লাগিলে দরোজা ও জানালা প্রভৃতি বন্ধ করিয়া দেওয়া আবশ্যক; কারণ বাহিরের বাতাস গৃহে প্রবেশ করিলে অগ্নি আরও প্রবল হইয়া উঠে। অতএব বায়ু-প্রবেশ-পথ রুদ্ধ করিয়া দিয়া অগ্নি নির্ব্বাণের উপায় করা উচিত। পর্দ্দা ও মশারিতে আগুণ লাগিলে একখানি কম্বল অথবা মোটা ভারি গোছের কাপড় দ্বারা বারম্বার আঘাত করিলে আগুণ নির্ব্বাণ হইয়া আসিবে। আর যদি সময় থাকে, তবে কম্বল ও কাঁথা প্রভৃতি ভিজাইয়া তাহার উপর ফেলিয়া দিলেও চলিতে পারে। নীচের সিঁড়িতে আগুণ প্রবল হইয়া দাঁড়াইলে সত্বর ছাদে উঠিয়া মই লাগাইয়া নামিতে হইবে। যদি একান্তই আগুণ-লাগা সিঁড়ির পথ ভিন্ন নামিয়া আসিবার কোন উপায় না থাকে, তবে যত শীঘ্র পারা যায়, হামাগুড়ি দিয়া বাহির হইয়া আসিতে হইবে। হামাগুড়ি দেওয়ার কারণ এই যে, তৎকালে গৃহমধ্যে এত ধূম সঞ্চিত হয় যে, তদ্দ্বারা

শ্বাস রোধ হইয়া মৃত্যু ঘটিতে পারে, কিন্তু ঘরের মেজেতে যে বায়ু-সঞ্চার থাকে, তদ্দ্বারা কোন অপকার ঘটে না। ঐ সময় কম্বল ও সতরঞ্চ এই সকলের অভাবে, ময়লা কাপড় দ্বারা সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া অতি সতর্কভাবে বাহির হইয়া আসিবার উপায় করা উচিত; সুবিধা হইলে উহা ভিজাইয়া লইতে পারিলে আরও ভাল হয়। অগ্নি নির্ব্বাণ করার দোষেও যে, অনেক সময় এই বিপদ ঘটিয়া থাকে, তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। কখন কখন এরূপ ঘটনাও হইতে দেখা যায় যে, গৃহস্থগণ অগ্নি নির্ব্বাণ করিলে পর তাহার মধ্যে দুই একখানি অঙ্গারের এক মুখে সামান্য আগুণ থাকে এবং অপর মুখ শীতল হইয়া যায়, বিড়াল কিম্বা ইঁদুরে সেই ঠাণ্ডামুখ কামড়াইয়া লইয়া গিয়া অঙ্গারখানি অন্য পদার্থের উপর রাখিয়াও এই সর্ব্বনাশ করিয়া তুলে।

কখন কখন দেখা যায় রন্ধন-শালায় তৈলাদি জলিয়া অনর্থ ঘটিয়া থাকে। তৈল জ্বলিয়া উঠিলে তাহার উপর কলাপাতা প্রভৃতি কতকগুলি দ্রব্য ফেলিয়া দেওয়া ভাল। হটাৎ যদি সেই পাত্রটী নামাইয়া ফেলা যায় তাহাও উত্তম। মাটীর হাঁড়ি হইলে কোন দ্রব্য দ্বারা ভাঙ্গিয়া ফেলাও সৎপরামর্শ। পল্লী-মধ্যে আগুণ লাগিলে প্রথমেই কর্ত্তব্য গ্রামের সমুদায় লোক একত্রিত হইয়া সেই অগ্নি নির্ব্বাণ করা; কিন্তু যখন নির্ব্বাণের আশা না থাকে, তখন স্ব স্ব গৃহস্থিত দ্রব্যাদি বাহির করিতে হইবে; গো, অশ্ব প্রভৃতি গৃহ-পালিত পশু ও বৃক্ষ,

স্ত্রীলোক এবং বালক-বালিকাদিগকে নিরাপদ স্থানে রাখিয়া অগ্নির আক্রামণ নিবারণ জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। যে সময় গ্রাম মধ্যে অগ্নি-ভয় উপস্থিত হইবে, সেই সময় প্রত্যেক গৃহে অর্থাৎ চালের উপর জল-পূর্ণ কলসী সাজাইয়া রাখা আবশ্যক। অগ্নি-দাহকালে নিতান্ত বিচলিত না হইয়া স্থিরভাবে কর্ত্তব্য-কার্য্য সম্পন্ন করা যে উচিত, তাহা সকলেই বুঝিতে পারিয়াছেন, কারণ যে পরিমাণে চঞ্চল হইয়া সময় নষ্ট করা যায়, সেই পরিমাণে ক্ষতি-গ্রস্ত হইতে হয়।

যে কোন বিষয়ে কৃতকার্য্যতা লাভ করিতে হইলে সুব্যবস্থা করা উচিত। সুব্যবস্থাগুণে অল্প সময়ে এবং অল্প লোক দ্বারা যে কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে, বিশৃঙ্খলভাবে অধিক সময় ব্যাপিয়া বহু সংখ্যক লোক দ্বারা তাহা নির্ব্বাহ হইয়া উঠে না। এজন্য অগ্নি-দাহ উপস্থিত হইলেই কতক লোক গৃহস্থিত বালকবালিকা, পীড়িত ও বৃদ্ধগণকে এবং দ্রব্যাদি বাহির করিবার ব্যবস্থা করিবেন। কপর অ-লে নিঅগ্নির্ব্বাণ সজন্য বিশেষ-রূপ চেষ্টা দেখিবেন। গৃহাদিতে আগুণ লাগিলে নিকটে যে জলাশয় থাকে, তাহা হইতে জল আনিয়া নির্ব্বাণ করিবার ব্যবস্থা করা উচিত। অধিকক্ষণ অন্তর জল ঢালিলে যে, আগুণ নির্ব্বাণ করা যায় না, তাহা সকলেরই মনে রাখা কর্ত্তব্য। এজন্য এবিষয়ে একটী নিয়ম জ্ঞাত থাকা আবশ্যক। অর্থাৎ যে সকল ব্যক্তি জল আনিতে প্রবৃত্ত হয়েন, তাঁহারা যেন অগ্নি-দাহ-স্থান হইতে জলাশয় পর্য্যন্ত শ্রেণীবদ্ধ-ভাবে দণ্ডায়মান হইয়া

পরস্পারের হাতে হাতে জল আনিয়া আগুণের উপর ঢালিতে আরম্ভ করেন। এইরূপ নিয়মে জল ঢালিলে ক্রমাগত জল-ধারা পতিত হওয়াতে উহা নির্ব্বাণ হইয়া যাইবে।

কোন গৃহে আগুণ লাগিলে তাহার নিকটবর্ত্তী গৃহাদিতে যাহাতে উহা লাগিতে না পারে, তজ্জন্য ঐ সকল গৃহের উপর জল লইয়া প্রস্তুত থাকা আবশ্যক অর্থাৎ যখন যে স্থানে আগুণ পড়িবে, তৎক্ষণাৎ যেন তাহা নির্ব্বাণ করা হয়। আগুণ নিবারণ অসাধ্য বোধ হইলে দহ্যমান্ গৃহ কাটিয়া ভূমিসাৎ করা ভাল। কারণ আগুণ নীচে পতিত হইলে উহা আর অধিক দূরে সঞ্চা-হইতে পারে না। অনেক সময়গিয়াছে,রিতদক্ষে থ পঞওা স্ক দ গৃহের অগ্নি ভাল রকম করিয়া নির্ব্বাণ না করিয়া গৃহস্থগণ নিশ্চিন্ত হইয়াছেন, অনন্তর তাহা হইতে অগ্নি সঞ্চারিত হইয়া আবার মহা অনর্থ ঘটাইয়াছে। রন্ধনাদিকালে গৃহে আগুণ লাগিলে অনেক রমণী মনে করিয়া থাকেন, সামান্যমাত্র জল দ্বারা তাহা নির্ব্বাণ করিতে পারিবেন, এই আশ্বাসে তাঁহারা লোক ডাকিয়া গোল না করিয়া নিজেই উহা নির্ব্বাণ করিতে চেষ্টা পাইয়া থাকেন, কিন্তু সে সামান্য চেষ্টায় কোন ফল না হইয়া বরং বিপদ আরও প্রবল হইয়া উঠে। এজন্য প্রথম হইতেই লোকজন ডাকিয়া বিশেষ সতর্কতার সহিত উহা নির্ব্বাণের চেষ্টা পাওয়া উচিত। বিপদ প্রবল আকার ধারণ করিতে না পায়, তাহার চেষ্টা করাই বুদ্ধিমানের কাজ।

গৃহ-পালিত গো, অশ্ব প্রভৃতি পশুগণ যাহাতে অগ্নি-দাহ

হইতে রক্ষা পায়, তাহার ব্যবস্থা করা অতীব কর্ত্তব্য, ইহা প্রত্যেক গৃহস্থেরই মনে রাখা উচিত। কোন কোন সময় এরূপও দেখা যায়, গৃহাদি দাহ-কালে পালিত পশুদিগের বন্ধন-রজ্জু কাটিয়া দিলে তাহারা বাহিরে আসিয়া আবার প্রজ্জ্বলিত গৃহে প্রবেশ করিয়া জীবন হারাইয়া থাকে, এজন্য তাহাদিগকে দূরে তাড়াইয়া দেওয়াই সুব্যবস্থা। অশ্বের একটী মহৎ দোষ অগ্নি-দাহকালে তাহারা প্রায়ই বাহিরে আইসে না। হাজার টানাটানি কর না কেন, কিছুতেই নড়িতে চাহে না। এরূপ হইলে তাহাদিগের গলদেশে হাল পরাইয়া তাহা ধরিয়া টানিলে তৎক্ষণাৎ তাহারা বাহির হইয়া আসিবে। অগ্নি-দাহকালে প্রজ্জ্বলিত গৃহ হইতে অশ্ব বাহির করিবার পক্ষে ইহা একটী অতি সুন্দর কৌশল।

প্রতি বৎসর বাজি পুড়াইতেও বালকাদি বিস্তর প্রাণির বিপদ ঘটিয়া থাকে। অতএব বারুদ হইতে অতি সাবধানে থাকা যে, কতদূর উচিত, তাহা প্রত্যেকেই বুঝিতে পারিতেছেন। যে গৃহে বারুদ থাকে, তথায় অগ্নি লইয়া যাওয়া যে, একটী বিপদকে আহ্বান করা তাহা যেন সকলেরই স্মরণ থাকে আজকাল বারুদের ন্যায় আর একটী বিপদের দ্রব্য গৃহস্থ-গৃহে প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিয়াছে; ঐ বিপদ-জনক দ্রব্য ক্যারোসিন অয়েল। ক্যারোসিন তৈল যার-পর-নাই দাহ্য পদার্থ; সামান্যমাত্র অগ্নি-স্পর্শে উহা প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে। প্রজ্জ্বলিত তৈলে জল ঢালিয়া অথবা অন্য কোন উপায়ে অগ্নি

নির্ব্বাণ করিতে পারা যায় না। এজন্য অতি সতর্কতার সহিত উহা ব্যবহার করিতে হয়। যে স্থানে অগ্নির কোন সংস্পর্শ থাকে না, এরূপ স্থানে উহা রাখাই উচিত। ফলতঃ যে কোন প্রকারেই হউক অগ্নির হাত হইতে মুক্তি-লাভ করিতে হইলে সাবধানতাই যে, তাহার একমাত্র অব্যর্থ উপায় তাহা যেন প্রত্যেক গৃহস্থেরই মনে থাকে।

জলমগ্ন বা জলে ডোবা।

শ্বাস-রোধ-জনিত যত প্রকার মৃত্যু আছে, তন্মধ্যে জলমগ্নতা-নিবন্ধন অধিকাংশ মৃত্যুই ঘটিয়া থাকে। অনেকের মনে বিশ্বাস জলমগ্ন ব্যক্তি উদর পূরিয়া জল খাইয়া থাকে, তজ্জন্যই তাহার মৃত্যু উপস্থিত হয়। বাস্তবিক এ বিশ্বাস সম্পূর্ণ ভুল। যে জল উদরে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে, তাহা পাকস্থলীতে আশ্রয় করে, তদ্দ্বারা মৃত্যু হয় না, তবে আবশ্যকের অতিরিক্ত জল প্রবিষ্ট হওয়াতে অপকার করিয়া থাকে। এ দেশে অনেকেরই মনে দৃঢ় বিশ্বাস উদরস্থ জল নির্গত করিতে পারিলেই জলমগ্ন ব্যক্তি জীবিত হইয়া উঠিবে, এজন্য অনেক স্থলেই দেখিতে পাওয়া যায়, জলমগ্ন ব্যক্তিকে জল হইতে তুলিয়াই তাহার পদ-দ্বয় উর্দ্ধদিকে এবং মুখ নিম্নদিক করা হয়, কখন কখন আবার পা ধরিয়া ঘুরাইয়া তাহার উদরস্থ জল নির্গমের চেষ্টা করার

হইয়া থাকে। এরূপ অনুষ্ঠান করিলে জলমগ্ন ব্যক্তির জীবন রক্ষা করা দূরে থাকুক, প্রত্যুতঃ তাহার মৃত্যুর সহায়তা করা হয়। অতএব সকলেরই এ বিষয়ে সাবধান হওয়া আবশ্যক। পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে, শ্বাসরোধই জলমগ্ন ব্যক্তির মৃত্যুর প্রধান কারণ। অতএব যাহাতে শ্বাস-রোধ না হয় ও সহজে শ্বাস-ক্রিয়া সম্পন্ন হইতে পারে, তদ্বিষয়ে লক্ষ্য রাখাই তাহার জীবন রক্ষার প্রধান উপায়, ইহা মনে রাখা উচিত।

কি কারণে জলমগ্ন ব্যক্তির শ্বাস-রোধ হইয়া থাকে, তাহার প্রকৃত কারণ অনেকেই অবগত নহেন। জলমগ্ন হইলে ফুস্- [illegible] মধ্যে বায়ু প্রবৃষ্ট হইয়া শ্বাস-ক্রিয়া নির্ব্বাহ করিতে পারে না। তজ্জন্য জলমগ্ন ব্যক্তির একমাত্র চিকিৎসা বা জীবন রক্ষার উপায় শ্বাস-প্রশ্বাস নির্ব্বাহের সুব্যবস্থা করা। যে যে উপায়ে জলমগ্ন ব্যক্তির জীবন রক্ষা হইতে পারে এক্ষণে তদ্বিষয় সবি- স্তারে লিখিত হইতেছে। প্রত্যেক ব্যক্তির কর্ত্তব্য, ঐ সকল উপায় অবগত থাকা, কারণ কখন্ যে, কোন্ পরিবারের ভাগ্যে ঐরূপ দুর্ঘটনা ঘটিবে, তাহার কিছুই স্থিরতা নাই! বিশেষতঃ অনেক স্থলে চিকিৎসক আনয়ন করিবার সময় পাওয়া যায় না, এজন্য চিকিৎসক আগমন করিবার অগ্রে কি কি করা বিধেয় তাহা কতকাংশে জানিয়া রাখা উচিত। অথবা যে সকল স্থানে আদৌ চিকিৎসক পাওয়া না যায়, তথায় প্রত্যেক পরিবারের কিছু কিছু নিয়ম জানিয়া রাখা যে অতীব আবশ্যক, তাহা সকলেই মুক্ত-কণ্ঠে স্বীকার করিবেন।

জলমগ্ন ব্যক্তিকে জল হইতে তুলিয়াই তৎক্ষণাৎ চীৎ করিয়া ও তাহার মস্তক ঈষৎ উন্নত-ভাবে রাখিয়া শয়ন করাইতে হয়। কেহ কেহ প্রথমে চীৎ না করিয়া অল্পক্ষণ উপুড় অথবা কাইৎ করিয়া রাখিয়া পরে চীৎ করাইয়া শয়ন করান। কিন্তু তদ্দারা বিলক্ষণ অনিষ্টের সম্ভব। এজন্য অতি সাবধানে ধীরে ধীরে তাহাকে চীৎ করিয়া শোয়াইয়া তাহার পরিধান আর্দ্র বস্ত্রাদি ত্যাগ করাইতে হইবে এবং শুষ্ক বস্ত্র দ্বারা সর্ব্ব শরীর উত্তমরূপ পুঁছাইয়া দিতে হইবে। অন্যান্য বস্ত্র অপেক্ষা ফ্লানেল্ কাপড় হইলেই বিশেষরূপ উপকার হইবে। সর্ব্বাঙ্গ পুঁছাইয়া দিয়া একখানি কম্বল দ্বারা তাহার গাত্র আচ্ছাদন করা আবশ্যক। যদি হটাৎ কম্বল সংগ্রহ করা কঠিন হইয়া উঠে, তবে সমাগত ব্যক্তিদিগের বস্ত্রাদি লইয়া আচ্ছাদন করিলেও চলিতে পারে।

অনন্তর জলমগ্ন স্থান হইতে যদি নিকটে লোকালয় থাকে, তবে অনতিবিলম্বে তাহাকে তথায় লইয়া যাওয়াই অতি সুপরামর্শ। কারণ জলাশয়ের ধারে অনাবৃত স্থানে অবস্থিতি করিলে শীতল বাতাসে রোগীর অনিষ্ট হইতে পারে। এজন্য অতি সাবধানে এবং বিলক্ষণ সত্বরতা সহকারে লইয়া যাইতে হইবে। আর যদি লোকালয় না থাকে, তবে কালবিলম্ব না করিয়া তথায় চিকিৎসা করাই সুব্যবস্থা। রোগী কোন বাড়ীতে নীত হইলে একটী গরম ঘরে, গরম শয্যাতে তাহাকে পূর্ব্বোল্লিখিতরূপে শয়ন করাইতে হইবে। শীতকাল হইলে গৃহে

অগ্নি রাখিলে বিশেষ উপকার হইতে পারে। কিন্তু চৈত্র বৈশাখের প্রখর রৌদ্রকালীন এই ঘটনা হইলে গৃহে অগ্নি না রাখিয়া বরং দ্বারাদি খুলিয়া দিলে ভাল হয়। রোগীর গৃহে অধিক লোকের জনতা হইতে দেওয়া কখনই কর্ত্তব্য নহে।

সচরাচর প্রায় তিন চারি মিনিট পর্য্যন্ত জলমগ্ন থাকিলেই জীবন নষ্ট হইয়া থাকে কিন্তু ভালরূপ সেবা সুশ্রূষা এবং নানা প্রকার উপায় অবলম্বন দ্বারা চৌদ্দ পনর মিনিট পর্য্যন্ত জলমগ্ন ব্যক্তিও জীবন লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে।

জলমগ্ন ব্যক্তিকে চীৎ করিয়া মস্তক অল্প উন্নতভাবে শয়ন করাইয়া তাহার নাসিকা এবং মুখ-মধ্যস্থ গাঁজ পানা প্রভৃতি যে সকল পদার্থ থাকে,তাহা ধুইয়া পুঁছিয়া দিতে হইবে। তাহার জিহ্বা অল্প পরিমাণ বাহির করিয়া ফিতা কিম্বা নেক-ড়ার ফালি দ্বারা বাঁধিয়া নিম্নের চোয়ালে আবদ্ধ রাখিলে ভাল হয়। এরূপ বাঁধিবার কারণ এই যে, জিহ্বা সরলভাবে বাহির থাকিলে মুখ মধ্যে সহজেই বায়ু প্রবেশ করিতে পারে ও তদ্দ্বারা শ্বাস-কার্য্য চলিবার সম্ভব। আর জিহ্বা মুখ-মধ্যে সঙ্কুচিত থাকিলে গলনালীর মুখ বদ্ধ হইবার সম্ভাবনা।

হাত সহ্য হয় এরূপ গরম জলে তাহাকে অল্পক্ষণ অবগাহন করাইয়া পুনর্ব্বার জল হইতে তুলিয়া পূর্ব্ববৎ চীৎ করাইয়া শোওয়াইতে হইবে এবং গরম কাপড় দ্বারা তাহার সর্ব্বাঙ্গ ঘন ঘন দলন করা আবশ্যক। এই সময় আর একটী বিষয় স্মরণ রাখা উচিত অর্থাৎ দলনকালে দেহের নিম্নভাগ হইতে উপরের

দিকে দলিলে ভাল হয়। এই সময় মষ্টার্ড গরম জলে গুলিয়া কিংবা তদ্ অভাবে রাইসরিষা বাটিয়া উরুতে, পায়ের ডিমে, হাত ও পায়ের তলায় প্রলেপ দেওয়া অতীব আবশ্যক, এই প্রলেপ দ্বারা ঐ সকল স্থানে রক্তের সঞ্চার হইবার সম্ভব। অঙ্গ প্রত্যঙ্গে রক্ত সঞ্চার হইলে রোগী শীঘ্রই জীবন লাভ করিতে সমর্থ হইবে। মষ্টার্ড্ কিম্বা রাইসরিষা অভাবে গরম জল-পূর্ণ বোতল হাত ও পায়ের তলায় বুলাইলেও উপকার হইতে পারে। দুই বগলের নিম্নে গরম জল-পূর্ণ বোতল কিম্বা অন্য কোন ধাতুপাত্রে জল পূরিয়া স্পর্শ করাইয়া রাখিতে হইবে। এই সকল বিষয়ে অসুবিধা হইলে দুইখানি ইট ঈষৎ গরম করিয়া দুই বগলের নিম্নে স্পর্শ করাইয়া রাখিলেও চলিতে পারে। নাকের ভিতর এমোনিয়া অথবা নিষাদল ও কলিচূণ একত্রে হাতে রগড়াইয়া রোগীকে ঘ্রাণ করাইতে হইবে। মধ্যে মধ্যে একবার গরম জল ও একবার ঠাণ্ডা জলের ছিটা তাহার মুখে এবং বুকে দিলে জ্ঞান সঞ্চার হইতে পারে। পাখীর পালক নাসিকা মধ্যে দিয়া সুড়সুড়ি দিলেও চেতনা হইতে পারে। অনেক স্থলে নস্য দ্বারাও উপকার হইতে দেখা যায়।

যতক্ষণ পর্য্যন্ত জলমগ্ন ব্যক্তির জ্ঞান সঞ্চার না হয়, ততক্ষণ কম্বলের আচ্ছাদন ত্যাগ করা উচিত নহে। গাত্র কম্বলে ঢাকিয়া কখন কখন সাড়ে আট ঘণ্টা পর্যন্ত ক্রমাগত এইরূপ-ভাবে রাখিয়া এবং ফ্লানেল্ দ্বারা গাত্র মার্জ্জনা প্রভৃতি প্রক্রিয়া দ্বারাও রোগীকে জীবিত করা হইয়াছে। অতএব জলমগ্ন

ব্যক্তিকে দম বন্ধ দেখিলেই তাহার জীবনের আশা পরিত্যাগ করিবে না। লিখিত সময় পর্য্যন্ত বিশেষরূপ চেষ্টা দেখিয়া বিফল হইলে, তখন তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিতে হইবে। দুই একটী লোকের পরিশ্রমে এই সকল কার্য্য নির্ব্বাহ হইয়া উঠে না, এজন্য প্রয়োজন মত লোক লইয়া চিকিৎসা করিতে হয়। যাহারা সেবা সুশ্রুষা করিবে, তাহাদিগের মধ্যে কার্য্য বিভাগ করিয়া লওয়া আবশ্যক। অর্থাৎ যে গরম কাপড় দ্বারা মার্জ্জনা করিবে, সে অক্ষম হইলে তৎপরিবর্ত্তে অপর ব্যক্তি সেই কার্য্যে নিযুক্ত হইবে। কেহ হাতে পায়ে রাইসরিষার প্রলেপ প্রভৃতি কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিবে। এইরূপে কার্য্য বিভাগ করিয়া লইলে কোন প্রকার অসুবিধা কিম্বা কোন রকম ত্রুটি ঘটিবে না। সুচারুরূপে সেবাসুশ্রুষাই যে, প্রধান ঔষধের কার্য্য করে, তাহা মনে রাখা আবশ্যক।

উপরিলিখিতরূপ কার্য্যে রোগীর জ্ঞান সঞ্চার হইলে পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তিকে কুড়ি ফোটা, পঞ্চম বৎসর পর্য্যন্ত পাঁচ ফোটা, দ্বাদশ বৎসর পর্য্যন্ত দশ ফোটা লাইকর এমোনিয়া অথবা অল্প পরিমাণ ব্রাণ্ডি জলে মিশাইয়া অল্প অল্প পরিমাণে সেবন করাইবে। কিন্তু যতক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার জ্ঞান সঞ্চার না হয়, ততক্ষণ কিছুমাত্র আহার করিতে দেওয়া উচিত নহে। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে রোগীর মস্তক গরম হইলে তাহার মস্তক ঈষৎ উন্নতভাবে স্থাপন করিয়া ও ডিকলম্ জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া অথবা ঠাণ্ডা জল তাহার মস্তকে দেওয়া আবশ্যক।

এ অবস্থায় ব্রাণ্ডি সেবন সম্পূর্ণ অবিধেয়। এই সময় একবার মল ত্যাগ হইলে ভাল হয়। অতএব মৃদু বিরেচক দ্রব্য দ্বারা বাহ্যে করাইলে বিশেষ উপকারের সম্ভব। আহার লঘু পথ্য।

জলমগ্ন ব্যক্তির শ্বাস-ক্রিয়া চলিতে আরম্ভ করিলে তাহার জীবনের আশা করা যাইতে পারে। এজন্য যাহাতে সত্বর নিশ্বাস প্রশ্বাস চলিতে পারে, তাহার উপায় বিধানে মনোযোগ দিতে হয়। অন্যান্য রোগীর ন্যায় জলমগ্ন ব্যক্তির জীবন কোন প্রকার ঔষধের উপর নির্ভর করে না। একমাত্র সেবা শুশ্রূষা এবং নানা প্রকার সহজ সহজ উপায় দ্বারা তাহার জীবন রক্ষা করিতে পারা যায়। অনেক স্থলে এরূপও দেখা গিয়াছে, জলমগ্ন ব্যক্তির একদিকের নাক টিপিয়া ধরিয়া অপর নাকের ভিতর কোন প্রকার নলের (অর্থাৎ পেঁপে, ভেরেণ্ডা কিবা কাগজের নলের) এক মুখ অল্পমাত্র প্রবিষ্ট করিয়া অপর মুখে ফুৎকার দিলেও শ্বাস ক্রিয়া চলিতে পারে। কখন কখন রোগীর দুই বাহু ধরিয়া একবার মস্তকের উর্দ্ধে, একবার বক্ষস্থলের উপর নামাইতে ও তুলিতে হইবে। এক মিনিটে অন্ততঃ কুড়িবার পর্য্যন্ত এইরূপ করিলে শ্বাস প্রশ্বাস সঞ্চার হইয়া থাকে।

বগলের নিম্নে অর্থাৎ দুই স্তনের নীচে এক একবার চাপিয়া ধরিয়া ছাড়িয়া দিতে হইবে। ইহাতেও ফুস্‌ফুসে বায়ু চলিতে পারে। এইরূপ প্রক্রিয়াকে "কৃত্রিম শ্বাস প্রশ্বাস সঞ্চার" কহিয়া থাকে।

জলমগ্ন ব্যক্তির জীবন রক্ষা কেবলমাত্র কতকগুলি সামান্য উপায় দ্বারা যে সম্পন্ন হইতে পারে, তাহা পাঠকগণ অনায়াসেই বুঝিতে পারিতেছেন। আমরা ইতিপূর্ব্বে যে সকল বিষয় বিস্তারিত করিয়া লিখিয়াছি, এক্ষণে রোগীর জীবন রক্ষা করিবার জন্য সেই সকলের প্রয়োজনীয় নিয়ম এবং ব্যবহৃত দ্রব্য সমূহের সংক্ষেপে উল্লেখ করিব। অতএব প্রত্যেক গৃহস্থের উচিত, নিম্নলিখিত বিষয়টী মনোযোগ সহকারে শিখিয়া রাখেন।

১। জল হইতে তুলিয়াই শুষ্ক বস্ত্রে গাত্র মার্জ্জনা করিতে হইবে।

২। মুখ ও নাকের মধ্যস্থ কর্দ্দম, শেওলা প্রভৃতি অপরিষ্কৃত পদার্থ উত্তমরূপে পরিষ্কার করিতে হইবে।

৩। কম্বল কিম্বা বস্ত্রাদি দ্বারা রোগীকে আচ্ছাদন করিতে হইবে।

৪। অল্প পরিমাণে মস্তক উন্নত করাইয়া শয়ন করাইতে হইবে।

৫। গরম জলে স্নান অথবা গরম গৃহে, গরম বিছানায় রোগীকে স্থাপন করিতে হইবে।

৬। নাকে নিষাদল ও চূণ মিশ্রিত অথবা অন্য কোন প্রকার নাস দিতে হইবে।

৭। কৃত্রিম শ্বাস প্রশ্বাস সঞ্চার করাইতে হইবে।

৮। গরম কাপড় দ্বারা গা ঘষিতে হইবে।

৯। রাইসরিষার প্রলেপ দিতে হইবে।

১০। গরম ইট কিম্বা গরম জল-পূর্ণ বোতল বগলের নীচে রাখিয়া সেক দিতে হইবে।

১১। জ্ঞান-সঞ্চার হইলে ব্রাণ্ডি সেবন করাইতে হইবে।

১২। রোগীকে নাড়াচাড়া করিবে না।

১৩। উপরিলিখিত সমুদায় নিয়মানুসারে চিকিৎসা ও সেবা শুশ্রূষা করিয়াও যদি কিছুতেই জ্ঞান সঞ্চার না হয়, তখন তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিবে।

সন্তরণ।

প্রত্যেক বালকবালিকাকে বাল্যকাল হইতেই সন্তরণ শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। অভ্যাস না থাকিলে ভালরূপ সাঁতার দিতে ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অতিরিক্ত পরিচালনে অত্যন্ত শ্রান্তি বোধ হইয়া থাকে, এজন্য অন্যান্য ব্যায়ামের ন্যায় সন্তানদিগের সন্তরণ শিক্ষার ব্যবস্থা করা আবশ্যক। কি নিয়মে শিক্ষা দিলে বালকগণ সন্তরণ শিখিতে পারিবে, তাহার সহজ উপায় লিখিত হইতেছে।

যে সকল ছোট ছেলেদিগকে সাঁতার শিখাইতে হইবে, ঘুন্‌সির ন্যায় তাহাদিগের কোমরে এক খণ্ড চামড়ার দল অথবা মোটা দড়ি বাঁধিয়া দিতে হইবে, পরে আর এক খণ্ড চামড়ার দল বা দড়ি লইয়াপ্রথমে যে কোমরবন্ধ বাঁধা হইয়াছে,

তাহার এক পার্শ্বে অর্থাৎ ডাইন হাত নীচের দিকে লম্বা ভাবে ঝুলাইয়া দিলে তাহা কোমর বন্ধের যে স্থানে ঠেকিবে,সেই স্থানে উক্ত দড়ির এক মুখ দৃঢ় করিয়া বাঁধিতে এবং অপর মুখ গলার পশ্চাৎ ভাগের উপর দিয়া আনিয়া বাঁ ধারের কোমরবন্ধের সহিত বাঁধিয়া দিতে হইবেক। পরে ঐ কোমরবন্ধের পশ্চাতে আর একগাছি দড়ি বা চামের দল বাঁধিয়া উক্ত দড়ির অপর মুখ একখানি মোটা লাঠির মাথায় জড়াইয়া রাখিতে হইবে। এখন বোধ হয় পাঠকগণ সহজেই বুঝিতে পারিয়াছেন, কোমর-বন্ধের সহিত দড়ি বাঁধিয়া গলা পেঁচিয়া আনিবার প্রয়োজন কি? ঐরূপ বাঁধায় কোমর বন্ধ আর ঢিলা হইয়া খুলিয়া পড়িবার কোন আশঙ্কা থাকে না।

এইরূপ বাঁধা হইলে এখন ছেলেটীকে উপুড় করিয়া জলে শয়ন করাইতে হইবে এবং তীরস্থ অন্য ব্যক্তি যেরূপভাবে ছিপে মাছ গাঁথিয়া খেলাইতে থাকে,সেইরূপ ভাবে ছেলেটীকে কখন বা শিথিল করিয়া জলে সাঁতার দিতে দড়ি ছাড়িয়া দিতে হইবে। এইরূপ নিয়মে কিছুদিন সাঁতার দিতে অভ্যাস করাইলে বালক বালিকাগণ সহজে এবং নিরাপদে সাঁতার শিখিতে পারিবে; সন্তরণ শিক্ষার যত প্রকার উপায় আছে, তন্মধ্যে এই উপায়টী সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

কখন কখন দেখা যায়, শিশুগণ অন্য ব্যক্তির বাহু, পৃষ্ঠ অবলম্বন করিয়া সাঁতার অভ্যাস করিয়া থাকে। কলসী উপুড় করিয়া তাহা আশ্রয় করিয়াও বিনা ক্লেশে সাঁতার শিখান

যাইতে পারে, কিন্তু প্রথমোক্ত উপায়ের ন্যায় কোনটীও নিরাপদ নহে। প্রথমোক্ত নিয়মে সাঁতার শিখিয়া যখন দেখা যাইবে, বালকগণ কোন প্রকার সাহায্য না লইয়া স্বাধীন-ভাবে সাঁতার দিতে পারে, তখন তাহাদিগকে সাঁতার দিবার নিমিত্ত জলে ছাড়িতে সাহস করিতে পারা যায়।

প্রথমে অধিক জলে সাঁতার দিতে যাওয়া পরামর্শসিদ্ধ নহে; কারণ যদি কোন কারণে হস্ত-পদাদি অবসন্ন হইয়া আইসে, তবে বিপদ ঘটিবার সম্ভব।

সাঁতার শিখিবার সময় আস্তে আস্তে জলের উপর শুইতে এবং মাথা ও গলা সোজা রাখিতে হইবে। সম্মুখ ভাগে বুক চাড়া দিতে ও এই সময় নিশ্বাস বন্ধ রাখিতে হইবে। নিশ্বাস বন্ধ করিলে শরীর আঁপনা হইতেই জলের উপর ভাসিয়া উঠিবে। সাঁতার দেওয়ার সময় হাত ও পা এক সঙ্গে চালনা করিতে হয়। সাঁতার কাটিবার সময় পশ্চাৎ অর্থাৎ পৃষ্ঠদেশ বেশী ডুবাইয়া রাখা উচিত নহে। জল কাটিয়া যাইবার সময় হাত দুখানি বুকের সম্মুখে থাকিবে; উভয় হস্তের আঙুল গুলি খোলা ও কাছাকাছি থাকিবে এবং বুড় আঙুল পাশের আঙুলের সহিত যোড়া থাকিবে। সাঁতার দেওয়ার সময় হাত অল্প বক্রভাবে রাখিয়া চালনা করিলে অধিক জল ভাঙ্গিতে পারে। তদ্দ্বারা দেহ অগ্রে চালিত হইয়া থাকে।

হস্তদ্বয় দ্বারা যে জল ভাঙ্গিবে, তাহা দুই বগলের নীচের দিকে ঠেলিয়া দিতে হইবে। এই সময় আর একটী কথা মনে

রাখা আবশ্যক অর্থাৎ হাত নাড়িবার সময় তাহা জলের উপরে চালিত না করিয়া জলের মধ্যেই চালনা করা আবশ্যক। আর হস্তদ্বয় যে সময় জল টানিয়া পশ্চাৎদিকে ঠেলিয়া দিবে, সে সময় হাত যেন কোমরের পশ্চাৎ পর্য্যন্ত না যায়। এইরূপ ভাবে সাঁতার দিয়া চলিলে অল্প সময়ের মধ্যে অধিক দূর অগ্রসর হওয়া যায়।

সাঁতার দেওয়ার সময় কনুই দুইটী একটু উঁচু করিয়া কব্জা জলের ভিতর দিয়া ঢেউ কাটিবে, তদ্দ্বারা দেহ একটু উঁচু হইয়া উঠিবে আর পা নাড়িবার সময় পায়ের পাতা দুখানি হাঁটুর নিকট পর্য্যন্ত আনিয়া যত পারা যায় জল কাটিতে হইবে।

যেরূপ নিয়মে হস্ত পদ চালনা দ্বারা সাঁতার দিতে হয়, মাটীর উপরও ঐরূপ শিখিতে পারা যায়। স্থলের উপর দুই খানি পা এক সঙ্গে চালনা করা সুবিধা হইতে পারে না। এজন্য এক একখানি পদ চালা অভ্যাস করা আবশ্যক। ইহা অভ্যাস করিতে হইলে একখানি চেয়ারের পশ্চাৎ দিকে দাঁড়াইয়া ডাইন হাত দ্বারা চেয়ারের বেক্ (পৃষ্ঠভাগ) ধরিবে এবং বাঁ পা অনবরত নাড়িতে থাকিবে, আবার বাঁ পা ক্লান্ত হইলে বাঁ হাতে ঐরূপ চেয়ার ধরিয়া ডাইন পা চালনা করিতে থাকিবে। এইরূপ নিয়মে দুই পা অধিকক্ষণ ধরিয়া চালনা করিতে অভ্যাস করিবে।

সাঁতার দেওয়ার সময় যেমন হস্ত পদাদি অঙ্গ চালনা অভ্যাস করিতে হয়, সেইরূপ শ্বাস প্রশ্বাস ফেলিতে অভ্যাস করা আবশ্যক। অর্থাৎ হাত দিয়া জল ঠেলিবার সময় দম বন্ধ

রাখিয়া পা দিয়া জল ঠেলিবার সময় নিশ্বাস ফেলিতে হয়। এইরূপ নিয়মে শ্বাস প্রশ্বাস ত্যাগ না করিলে দেহ জলমগ্ন হইবার সম্ভব।

স্রোত-মুখে সাঁতার দিলে অধিক পরিশ্রম করিতে হয় না, জলের গতির সহিত দেহ চালিত হইয়া থাকে, কিন্তু স্রোতের বিপরীত দিকে সাঁতার দিতে হইলে অধিক বলের প্রয়োজন হইয়া থাকে। এজন্য যাহারা সন্তরণে ভালরূপ দক্ষতা লাভ করে নাই, তাহারা যেন ইহাতে প্রবৃত্ত না হয়।

সাঁতার দিতে এককালে অধিক জলে যাইতে হইলে আপনার সামর্থ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া অগ্রসর হওয়া উচিত। কারণ কখন কখন এরূপও দেখা গিয়াছে যে, অনেকে প্রথম উদ্যমে অধিক জলে গমন করিয়া পরিশেষে ফিরিয়া আসিবার সময় এত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে যে, আর হস্ত পদাদি চালনা করিতে পারে না, অবশেষে জলমগ্ন হইয়া জীবন হারাইয়া থাকে।

কোন উচ্চস্থান হইতে সহসা জলে ঝাঁপ দিয়া পড়া অত্যন্ত অনিষ্ট-জনক ; কারণ তদ্দ্বারা শরীরাভ্যন্তরস্থ যন্ত্র সমূহে আঘাত প্রাপ্ত হইতে পারে। কখন কখন দেখিতে পাওয়া যায়, বালকগণ উর্দ্ধ হইতে লম্ফ প্রদান করিয়া জলে পড়িয়া থাকে, ইহাতে হস্ত পদ এবং বক্ষস্থলে গুরুতর আঘাত লাগিবার সম্ভব। কখন কখন এই দুর্ঘটনায় মৃত্যু পর্য্যন্তও উপস্থিত হইয়া থাকে। অত্যন্ত পরিশ্রমের পর অর্থাৎ ঘাম মরিয়া শরীর শীতল না হইলে স্নান করা উচিত নহে। কারণ

স্নান করিয়া শীতল হইলে ঘর্ম্মরোধ হইয়া মহা অনিষ্ট হইতে পারে, এমন কি কখন কখন ইহাতে মৃত্যুও হইবার সম্ভব। আর সহসা গরমের উপর ঠাণ্ডা করা উচিত নহে।

উচ্চ হইতে পতন।

ছাদ এবং বৃক্ষ প্রভৃতি উচ্চ স্থান হইতে পতিত হইলে, কেবলমাত্র যে, হস্ত পদাদি ভাঙ্গিবার আশঙ্কা থাকে, এরূপ নহে, তদ্দ্বারা অনেক সময় জীবন পর্য্যন্তও নষ্ট হইয়া থাকে; এজন্য কোন উচ্চ স্থানে উঠিতে হইলে অতি সাবধানে উঠা আবশ্যক। কোন কোন বালকের এরূপ স্বভাব যে, তাহারা সর্ব্বদা বৃক্ষে উঠিয়া থাকে। বৃক্ষে উঠিবার সময় অত্যন্ত সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য অর্থাৎ বৃক্ষের যে সকল শাখা ভাঙ্গিবার সম্ভব তাহা আশ্রয় করা উচিত নহে।

কোন কোন বালক ছাদের উপর ঘুড়ী উড়াইতে উড়াইতে এতদূর অন্যমনস্ক হয় যে, ঘুড়ীর দিকে লক্ষ্য রাখিয়া পশ্চাৎ আসিতে আসিতে নিম্নে পতিত হইয়া থাকে। তজ্জন্য যে ছাদের চারিধার ঘেরা নহে, তথায় তাহাদিগকে কোন প্রকার খেলা করিতে দেওয়া উচিত নহে।

কোন উচ্চ স্থান হইতে পতিত হইয়া অচেতন হইলে তাহাকে সমান স্থানে শোয়াইয়া ঘন ঘন বাতাস দিতে হইবে এবং শীতল জল দ্বারা সর্ব্বদা তাহার মস্তক এবং চোকে ও মুখে

ছিটা মারিতে হইবে। যদি দেখা যায় পতিত ব্যক্তির শ্বাস বন্ধ হইয়াছে, তবে কালবিলম্ব না করিয়া তাহার দুই পাশে দুই ব্যক্তি হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া এক একজনে রোগীর এক এক বাহুর কণুয়ের কাছে ধরিয়া দুই জনেই এক সময়ে তাহার দুই বাহু দুই কাণে লাগাইবে; এইরূপ করিলে ফুস্‌ফুসে বাতাস প্রবেশ করিবে। দুই পল পরে আবার দুই জনে একত্রে রোগীর বাহু বুকের উপর দিয়া অল্প চাপিয়া উহার দুই পার্শ্বে বসিবে। ইহা দ্বারা ফুস্‌ফুস্ হইতে বায়ু নির্গত হইয়া শ্বাস বহিতে থাকিবে। আবার পূর্ব্ববৎ রোগীর দুই বাহু তাহার মাথার উপর তুলিবে। এইরূপ খানিকক্ষণ করিলে শ্বাস প্রশ্বাস বহিতে থাকিবে।

আর যদি পতিত ব্যক্তির শ্বাস প্রশ্বাস চলিতে থাকে, অথচ সে অজ্ঞান ভাবাপন্ন হয়, তাহা হইলে জানিতে হইবে যে, তাহার মস্তিষ্কে আঘাত লাগিয়াছে, তখন কালবিলম্ব না করিয়া যদি বরফ পাওয়া যায়, তবে তাহা, কিম্বা তদভাবে শীতল জল তাহার মস্তকে সর্ব্বদা দিতে হইবে। রোগীর অজ্ঞানাবস্থায় যদি কর্ণ হইতে শোণিত নির্গত হইতে থাকে, তবে জানিতে হইবে যে, তাহার মস্তকের অভ্যন্তরস্থ কোন অস্থিতে গুরুতর আঘাত লাগিয়াছে। এরূপ অবস্থায় রোগী প্রায় অজ্ঞান হইয়া থাকে। চিকিৎসকের আগমন পর্য্যন্ত বরফ কিম্বা শীতল জল তাহার মস্তকে দেওয়াই প্রধান চিকিৎসা। এরূপ ব্যক্তির জীবন রক্ষা পাওয়া সুকঠিন।

উচ্চ স্থান হইতে পতিত হইলে অস্থি ভঙ্গ, অস্থি স্থানচ্যুত, অঙ্গ বিশেষ মোচড় খাওয়া অথবা থেঁতিলিয়া যাওয়া এবং কাটিয়া রক্তপাত এই কয়েকটী অবস্থা হইবার সম্ভব।

পতিত ব্যক্তিকে শায়িত করাইয়া তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পরীক্ষা করিলে ঐ সকল অবস্থা জানিতে পারা যায়। লম্বাভাবে শোয়াইয়া তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পরীক্ষা করিয়া দেখা আবশ্যক অর্থাৎ হাত, পা এবং বুক প্রভৃতি কোন স্থানের হাড় ভাঙ্গিয়াছে কিম্বা তাহা স্থান-চ্যুত হইয়াছে কি না। যদি অস্থি স্থান-চ্যুত কিম্বা ভঙ্গ হইয়া থাকে, তবে সুদক্ষ চিকিৎসক আনাইয়া তাহার চিকিৎসা করার ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। কারণ চিকিৎসার বিলম্ব হইলে আঘাত প্রাপ্ত স্থান যদি ফুলিয়া উঠে, তবে হাড় সরাইয়া কিম্বা যোড়া দেওয়ার ব্যবস্থা করা কঠিন হইয়া উঠিবে।

চিকিৎসক আসিতে যে সময় লাগিবে, সেই সময়ের মধ্যে রোগী যেভাবে শুইয়া থাকিতে আরাম বোধ করিবে, তাহাকে সেইভাবে শয়ন করিতে দিবে।

যদি কোন স্থান কাটিয়া গিয়া রক্ত পড়িতে আরম্ভ হয়, তবে রক্তস্রাব বন্ধ করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

পতিত হইয়া যদি কাঁটা প্রভৃতি শরীরে ফুটিয়া যায়, তবে তাহাও অবিলম্বে বাহির করিয়া দিতে হইবে।

অস্থি সন্ধিস্থল-চ্যুত।—অর্থাৎ আঘাত প্রাপ্ত হইলে তত্রস্থ অস্থি সরিয়া যায়। সরিয়া গেলে সে স্থান ফুলিয়া উঠে; সে অঙ্গের

স্বাভাবিক অবস্থা থাকে না ; অর্থাৎ হাড় সরিয়া সে অঙ্গ বড় বা ছোট দেখায় কিম্বা সন্ধিস্থলের একস্থান উঁচু কিম্বা নীচু হইয়া পড়ে। এরূপ অবস্থা ঘটিলে বিচক্ষণচিকিৎসকের দ্বারাই চিকিৎসা করান বিধি। কিন্তু চিকিৎসক না পাওয়া গেলে যে গাঁইটের হাড় সরিয়া যায়, সে অঙ্গ কোন কঠিন স্থানে রাখিয়া (অর্থাৎ যেন না সরিয়া যায়) অথবা হাত দিয়া ধরিয়া যে স্থান হইতে হাড় সরিয়া গিয়াছে, সেই স্থানে যাহাতে তাহা আসিতে পারে এরূপ নিয়মে ধীরে ধীরে টানিতে হইবে। বলপূর্ব্বক টানিলে শিরাদি ছিঁড়িয়া অন্য রকম বিপদ হইবার সম্ভব। হাড় বসাইতে হইলে আদৌ বিলম্ব না করিয়া যত শীঘ্র পারা যায়, তাহার ব্যবস্থা করা আবশ্যক ; কারণ বিলম্ব হইলে তাহা বসান কঠিন হইয়া উঠে। আর যদি রোগী বলবান এবং তাহার মাংস-পেশী সমূহ দৃঢ় থাকে, তবে হাড় টানিলে সহজে উহা সরিয়া আইসে না। এজন্য প্রথমে তাহার মাংস-পেশী সমূহ শিথিল অর্থাৎ ঢিলা করিবার ব্যবস্থা করিয়া হাড় সরাইয়া দিতে হইবে। রোগীকে গরম জলে স্নান কিম্বা বমি হওয়ার ঔষধ সেবন করাইলে তাহার মাংস-পেশী শিথিল হইয়া আসিবে, তখন আস্তে আস্তে হাড় টানিয়া পূর্ব্বস্থানে আনিবার চেষ্টা করা উচিত।

হাড় বসান হইলে নেকড়া দ্বারা বেণ্ডেজ্ বাঁধিয়া দেওয়া আবশ্যক। কারণ বেণ্ডেজ্ না বাঁধিলে হাড় পুনর্ব্বার সরিয়া যাইবার আশঙ্কা থাকে। হাড় বসান হইলে তাহার পর যদি সে স্থান ফুলিয়া উঠে, তবে গুলার্ডাস লোসন

(Goulords Lotiou) অথবা শীতল জলে ভিজাইয়া রাখিবে।

জ্বর না হইলে সহজ অবস্থায় রোগী যাহা আহার করিয়া থাকে, তাহাই পথ্যে ব্যবহার করিবে। জ্বর হইলে রোগীর ন্যায় আহারের ব্যবস্থা।

অল্প চেষ্টাতে যদি হাড় না বসে, তবে ১২।১৪ দিনের মধ্যেও কোন চিকিৎসকের নিকট লইয়া গেলেও চলিতে পারে। কিন্তু বিলম্ব না করিয়া যত শীঘ্র বসাইতে পারা যায়, তাহাই উত্তম।

অস্থি-ভঙ্গ।—অস্থি-ভঙ্গ হইলে অঙ্গের স্বাভাবিক আকার থাকে না, নড় নড় করিতে থাকে, সেই অঙ্গ নাড়িলে ভিতর হইতে হাড়ে হাড়ে ঠেকাঠেকির ন্যায় শব্দ হয়, ঐ অঙ্গ সহজে নাড়িতে চাড়িতে পারা যায় না, উহা অনেক ছোট হইয়া যায়।

এইরূপ অবস্থা ঘটিলে চিকিৎসকের সাহায্য লওয়াই সুপরামর্শ। তবে যেখানে চিকিৎসক না পাওয়া যায়, তথায় লিখিত নিয়মে চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতে হইবে। যে অঙ্গ ভাঙ্গিয়া যায়, তাহার দুইধার ধরিয়া ধীরে ধীরে টানিতে হইবে, উহা এরূপ হিসাবে টানিতে হইবে যে, যে অঙ্গে আঘাত না লাগিয়াছে ভগ্ন অঙ্গ যেন ঠিক সেই পরিমাণ আকারে উপস্থিত হয়। ঠিক এইরূপ অবস্থা হইলে ভগ্ন স্থানের উপর ও নীচে দুইখানি কাঠের বাড় দিয়া বেণ্ডেজ্ বাঁধিয়া দিতে হইবে।

অধিক থেঁতলিয়া গেলে গরম জলে সে স্থানটি ধুইয়া চিটা-গুড় নেকড়ায় লাগাইয়া উক্ত স্থানে পটি বাঁধিয়া দিবে। আঘাত লাগিবামাত্র সে স্থানে যদি একভাগ টিংচার অব আর্ণিকা ও আট ভাগ জল মিশাইয়া পটি দেওয়া যায়, তবে শীঘ্র আরাম হইতে পারে। আর যাহাদিগের রক্তের তেজ কম অর্থাৎ বৃদ্ধ প্রভৃতি ব্যক্তিগণের কোন স্থানে মদের সেক দিলে আশু উপকার হইবার কথা।

মোচড় খাওয়া।—মোচড় খাওয়া অনেকে সহজ আঘাত মনে করিয়া থাকেন, কিন্তু কথন কথন উহাতে ভাঙ্গিয়া যাওয়া অপেক্ষা অধিক দিন পর্য্যন্ত কষ্ট থাকে। যে স্থানে মোচড় লাগে, তথায় ঠাণ্ডা জলের পটি কিম্বা গরম জলের সেক দিলে উপকার হইতে পারে। দুই তিন দিন পর্য্যন্ত গরম জলের সেক দিয়াও যদি আরাম না হয়, তবে আধ ছটাক নিষাদল তিন পোয়া ঠাণ্ডা জলে মিশাইয়া উক্ত স্থানে পটি দিবে। মোচড়ান স্থানে অধিক বল প্রকাশ পূর্ব্বক নাড়া চাড়া করা উচিত নহে, অথচ এককালে নাড়া-চাড়া বন্ধ করিলেও উক্ত স্থান বদ্ধ হইয়া যাইবার সম্ভব; এজন্য অল্প অল্প চালিত করা আবশ্যক। চূণ, হরিদ্রা এবং সোরা এক সঙ্গে গরম করিয়া প্রলেপ দিলেও আরাম হইতে পারে। লবণের পুটলি করিয়া মোচড়ান স্থানে সেক দিলেও সহজে আরাম হইয়া থাকে।

রক্ত-বমন।

কখন কখন এরূপ দেখা যায়, কাহারও কোন রোগ নাই অথচ সহসা রক্ত বমন হইয়া থাকে। রক্তপিত্ত রোগে যদিও মুখ হইতে রক্ত উঠিয়া থাকে কিন্তু তাহা রক্ত বমন অপেক্ষা আশঙ্কা-জনক। সচরাচর অনেক সময় রক্ত-বমন ও রক্তপিত্ত রোগ অনেকেই নির্ণয় করিতে পারে না। এস্থলে এই উভয়-বিধ রোগের স্থূল স্থূল লক্ষণ নিম্নে লিখিত হইল।

রক্তপিত্ত।—রক্তপিত্তে ফুসফুস হইতে রক্ত উঠিয়া থাকে। এই রক্ত লালবর্ণবিশিষ্ট। রক্তপিত্ত রোগে বুকে বেদনা হয় এবং কাশির সহিত রক্ত উঠিয়া থাকে। কিন্তু রক্ত বমনে এই সকল লক্ষণ প্রায়ই দেখা যায় না।

রক্ত বমন।—রক্ত বমনে যে রক্ত উঠিয়া থাকে, তাহা ফেণা ফেণা হয় না, রক্তের বর্ণ কাল্‌ছে ধরণের হয়, অধিক পরিমাণে রক্ত উঠিয়া থাকে। কাল্‌ছে ধরণের হয় তাহার কারণ উদরস্থ অম্লরস উহার সহিত মিশ্রিত হইয়া এরূপ বিবর্ণতা উৎপাদন করিয়া থাকে।

কারণ ও লক্ষণ।—নানা কারণে রক্ত বমন হইয়া থাকে। অর্শ এবং নাসিকা হইতে রক্তস্রাব বন্ধ হইলে কখন কখন রক্ত বমন হইয়া থাকে। নানা কারণে রক্ত দূষিত হইলেও রক্ত বমন হইতে পারে; ক্ষত-জনিত রক্ত অধিক পরিমাণে উঠে না এবং তাহা প্রায় আহারের পরেই উঠিয়া থাকে।

এ স্থলে আর একটী কথা মনে রাখা উচিত, অর্থাৎ হাড় ভাঙ্গিলেই যে, তাহা টানিয়া দিতে হইবে, এরূপ নহে, যে হাড় ভাঙ্গিয়া স্বাভাবিক আকারেই থাকে, সেখানে টানিবার কোন প্রয়োজন হয় না। টানিবার নিয়ম এই যে, ভগ্ন অস্থি যেন ঠিক মুখমুখী হইতে পারে।

অন্যূন এক মাসের মধ্যে হাড় যোড়া লাগিতে পারে, কিন্তু দেড় মাস পর্য্যন্ত বন্ধন রাখা আবশ্যক। তবে বেণ্ডেজ্ ঢিলা হইলে মধ্যে মধ্যে উহা আঁটিয়া বাঁধিয়া দিতে হইবে।

রোগী অধিক দুর্ব্বল হইলে অল্প পরিমাণে মদিরিকা অথবা এমোনিয়া জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিতে দিতে হইবে। আর যদি ভগ্ন স্থান ফুলিয়া উঠে এবং বেদনা থাকে, তবে পূর্ব্বোক্ত আরক লাগাইয়া দিবে।

পতিত ব্যক্তির অঙ্গ কাটিয়া রক্তস্রাব হইতে আরম্ভ হইলে, প্রথমেই সেই কর্ত্তিত স্থানে যে সকল পদার্থ প্রবেশ করিয়া থাকে, তৎসমুদায় বাহির করিয়া দিতে হয়। তাহা বাহির করিয়া দেওয়ার পর যদি ক্ষত-স্থান হইতে লাল রক্ত পড়িতে থাকে, তবে ক্ষত স্থানের উপরে পটি বাঁধিয়া দিতে হইবে। আর যদি কাল্‌ছে ধরণে রক্ত পড়িতে থাকে তবে ক্ষত স্থানের নীচে বাঁধিয়া দিতে হইবে। এরূপ বাঁধিবার কারণ এই যে, আমাদের শরীরে দুই প্রকার রক্ত চালিত হইয়া থাকে, অর্থাৎ যে রক্ত পরিষ্কৃত তাহা সমুদায় অঙ্গ প্রত্যঙ্গে সঞ্চারিত হয়, আর যাহা অপরিষ্কৃত তাহা পরিষ্কৃত হইবার জন্য বক্ষস্থলের

দিকে সঞ্চারিত হয়। সুতরাং ক্ষত স্থানের উপরে বাঁধিলে লাল রক্ত নির্গত হইবার পথ বন্ধ হইয়া যাইবে। আর কাল্‌ছে রক্ত ভিতরের দিকে গমন করিতে থাকে, ক্ষত স্থানের নীচে বাঁধিলে তাহা বাহিরে না পড়িয়া শরীরের অভ্যন্তরে গমন করিবে।

কৰ্ত্তিত স্থান টানিয়া উভয় মুখ যতদূর জুড়িয়া দেওয়ার ব্যবস্থা করা যাইতে পারে সেইরূপ করিয়া বাঁধিয়া দিতে চেষ্টা করিতে হইবে। পরে ক্ষত স্থানের উপর একখানি পাতলা নেকড়া আচ্ছাদন করিয়া তাহার উপর তামাকের গুলচূর্ণ দিয়া বাঁধিয়া দিলে প্রায় জোড় লাগিয়া যাইবে। প্রথম দিন এইরূপ বাঁধিয়া দ্বিতীয় দিন উহা খুলিলে যদিও সম্পূর্ণ জোড়া না লাগে, তবে অনেকটা পূরিয়া আসিবে। পরে তাহাতে শুকা মলম দিলেই আরাম হইবে। তামাকের গুলের অভাবে দূর্ব্বা ঘাস চিবাইয়াও বাঁধিয়া দিলে উপকার হইবে।

অস্ত্র দ্বারা পরিষ্কাররূপে কাটিয়া গেলে, কাটা মুখের দুই ধার টানিয়া জুড়িয়া বাঁধিয়া রাখিলেই জোড় লাগিয়া যাইবে।

থেঁতিলিয়া যাওয়া।—সুজি কিম্বা পাঁউরুটির পুল্‌টিস্‌ বাঁধিয়া রাখিলে সহজেই আরাম হইতে পারে। আর যদি একট্রাক্ট অব্‌ লেড্‌ পাওয়া যায়, তবে তাহার পটি বাঁধিয়া রাখিলেই সদ্য আরাম হয়। সহজ রকম থেঁতলান হইলে ঠাণ্ডা জলের পটি বাঁধিয়া রাখিলেই আরাম যইবে।

পেটের মধ্যে কোন শিরা ফাটিয়া বেশী পরিমাণ রক্ত উঠিলে রোগী অনতিবিলম্বে মৃত্যু-মুখে পতিত হইতে দেখা যায়। সচরাচর দেখা যায় পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকদিগেরই এই রোগ অধিক হইয়া থাকে।

রক্ত বমনের পূর্ব্বেই প্রায় পেট ভার, কোষ্ঠ-বদ্ধ, শরীর দুর্ব্বল এবং অসুস্থ হইয়া থাকে। গা বমি বমি করিতে থাকে এবং রক্ত উঠিলে শরীর ও মন আরও নিস্তেজ ও দুর্ব্বল বোধ হয়। রক্ত উঠা ও রক্ত ক্ষয় একটি সাংঘাতিক রোগ, এই ধারণাতে রোগী প্রায় হতাশ হইয়া পড়ে।

রক্ত বমন রোগে কেবলমাত্র যে, মুখ হইতে রক্ত উঠিয়া থাকে এরূপ নহে; কখন কখন মলদ্বার দিয়াও রক্ত নির্গত হইতে দেখা যায়। মলদ্বার দিয়া যে রক্ত নির্গত হয় তাহা প্রায় মলের সহিত নির্গত হইয়া থাকে এবং তাহা আল্‌কাতরার ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট। এই রক্ত, পেট কিম্বা নাড়ী ক্ষত হইলেও নির্গত হইয়া থাকে এবং অর্শরোগেও মলদ্বার দিয়া রক্ত নির্গত হইতে দেখা যায় কিন্তু অর্শের রক্ত আর এ রক্ত স্বতন্ত্র প্রকার। সুতরাং চিকিৎসার সময় যেন ভুল না হয়।

চিকিৎসা।—রক্ত বমন হইতে আরম্ভ হইলে এক ছটাক দুগ্ধ কিম্বা জলের সহিত কুড়ি ফোটা তার্পিণ তৈল দুই ঘণ্টা অন্তর অন্তর সেবন করিলে রক্ত বন্ধ হইয়া আসিবে। এক ছটাক পরিমাণে দুর্ব্বাঘাসের রস দুই তিন ঘণ্টা অন্তর

অন্তর সেবন করিলেও উপশম হইতে পারে। উহার অভাবে আয়াপানের রস কিম্বা গাঁদা ফুলের পাতার রস সেবন ব্যবস্থা। পুরাতন কুমড়ার (দেশী) জল, কাশীর চিনির সহিত মিশাইয়া সেবন করিলে বিশেষরূপ উপকার হইয়া থাকে। গ্যালিক এসিড দুই কাঁচ্চা এবং ডাইলিউট সল্‌ফিউরিক এসিড দশ ফোটা, এক কাঁচ্চা জলে মিশাইয়া তিন ঘণ্টা অন্তর অন্তর সেবন করাইলে রক্ত বন্ধ হইয়া আসিবে। অনেক দিন হইতে অল্প অল্প রক্ত উঠিতে থাকিলে প্রতিদিন পাঁচ ফোটা করিয়া সল্‌ফিউরিক এসিড সেবনের ব্যবস্থা করিলে উহা নিবারণ হইয়া থাকে।

রক্ত বমনকালে পেটের উপর বরফ অথবা শীতল জলের পটি দিবে। রোগীকে নড়িতে চড়িতে না দিয়া এক স্থানে স্থিরভাবে শয়ন করাইয়া রাখিবে। সুশীতল এবং অম্লসংযুক্ত পানীয় দ্রব্য আহারের ব্যবস্থা করিবে। সর্ব্বদা বরফ খাইতে দিবে। মাংসের কাথের সহিত পোর্ট মধ্যে মধ্যে পথ্যের ব্যবস্থা করিবে। রোগী দুর্ব্বল হইলে পোর্টের পরিবর্ত্তে ব্রাণ্ডি প্রয়োগ করা আবশ্যক।

মলের সহিত বদ রক্ত নির্গত হইলে প্রথমে জোলাপ দিবে। পরে পাঁচ ফোটা সল্‌ফিউরিক এসিড এক ছটাক চিরতার জলের সহিত মিশাইয়া সেবনের ব্যবস্থা করিবে। পোর্ট কিম্বা ব্রাণ্ডির সহিত অল্প পরিমাণ আফিং মিশাইয়া মল দ্বারে পিচ্‌কারী দিলেও বিশেষ উপকার সম্ভব। যে কোন

প্রকার রক্তস্রাবে যজ্ঞডুমুর অথবা ছাঁচি কুমড়া ঘৃতে ভাজিয়া পথ্যে ব্যবস্থা করিলে উপকার হইয়া থাকে।

রক্ত বমনে হতাশ্বাস হওয়া উচিত নহে। নিকটে উপযুক্ত চিকিৎসক থাকিলে তাঁহা দ্বারা চিকিৎসা করাই সুপরামর্শ। পরিবার মধ্যে কাহারও হটাৎ রক্ত বমন হইলে ভীত না হইয়া উপরি লিখিত ব্যবস্থা মত চিকিৎসা করিলে নিশ্চয়ই রক্ত বন্ধ হইয়া আসিবে। যে কয়েকটী ইংরাজী ঔষধের নাম লিখিত হইল উহার মূল্য অতি সামান্য; প্রত্যেক ডাক্তারখানায় পাওয়া গিয়া থাকে। আশা করি প্রত্যেক গৃহস্থবর্গ বিশেষ মনোযোগের সহিত এই বিষয়টী পাঠ করিবেন।

নাসিকা হইতে রক্ত-স্রাব।

অনেক সময় দেখিতে পাওয়া যায়, বালক ও বালিকাগণ ক্রীড়াদি করিয়া বেড়াইতেছে, কিম্বা কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত আছে, অথবা শয়ন করিয়া রহিয়াছে, সেই সময় হটাৎ তাহাদিগের নাসিকা হইতে রক্ত পড়িতে থাকে। দুর্ব্বল অপেক্ষা হৃষ্টপুষ্ট অর্থাৎ যাহাদিগের শরীরে রক্তের পরিমাণ অধিক এরূপ বালক বালিকাদিগের মধ্যে অনেকেরই এই রোগ দেখিতে পাওয়া যায়। অনেক প্রকার রোগের অবস্থায় অর্থাৎ জ্বর, প্লীহা, কৃমি এবং ন্যাসা প্রভৃতি পীড়াতেও নাসিকা

হইতে রক্ত-স্রাব হইয়া থাকে। নূতন অথবা জীর্ণ রোগে এইরূপ রক্ত-স্রাব চিকিৎসকের ব্যবস্থানুসারে আরাম করা উচিত।

সুস্থ-দেহ বালক ও বালিকার নাসিকা হইতে হটাৎ রক্ত-স্রাব দর্শন করিয়া অনেক সময় অনেক গৃহস্থ নিতান্ত বিব্রত হইয়া পড়েন। বিশেষতঃ যে সকল স্থানে উপযুক্ত চিকিৎসক নাই, তথায় ঐরূপ বিব্রত হওয়া কিছু অসঙ্গত নহে। এজন্য প্রত্যেক গৃহস্থের উচিত ও সম্বন্ধে দুই একটী সহজ ঔষধ অথবা নিবারণের উপায় শিখিয়া রাখেন ; কারণ অনেক সময় দেখা গিয়াছে, চিকিৎসক ডাকিয়া আনিতে আনিতে বালক বালিকারা অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে।

নাসিকা হইতে রক্ত-স্রাব হইলেই যে, তাহা অপকার-জনক বিবেচনা করা উচিত নহে, তবে স্থল বিশেষে অনিষ্ট হইয়া থাকে। এজন্য প্রথম হইতেই সতর্ক হওয়া উচিত। নাসিকা হইতে অল্প পরিমিত রক্ত পড়িলে তাহা নিবারণ না করাই ভাল ;—কারণ স্বভাব হইতে যেমন রক্ত-স্রাব হইতে আরম্ভ হইয়া থাকে, সেইরূপ প্রায় আপনাপনিই উহা বন্ধ হইতে দেখা যায়। বিশেষতঃ উহা রোধ করিলে অন্য প্রকার রোগ হইবার খুব সম্ভব। প্রকৃতির কেমন আশ্চর্য্য নিয়ম, আমাদের দেহে আবশ্যকের অতিরিক্ত কিছুই থাকিতে পারে না, শরীরে প্রয়োজনের অতিরিক্ত শোণিত হইলেই সময় সময় তাহা নির্গত হইয়া শরীরস্থ রক্তের সমতা রক্ষা করিয়া থাকে। আবার সময়

বিশেষে এরূপও দেখা যায়, অন্য কোন প্রকার রোগ উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে ঐরূপ শোণিত-স্রাব হইয়া সেই রোগের আক্রমণ হইতে দেহ রক্ষা করিয়া থাকে। এইজন্য সামান্য রক্ত-স্রাব নিবারণ না করাই ভাল। কিন্তু যখন দেখা যাইবে, রক্ত-স্রাব অত্যন্ত বৃদ্ধি হইতেছে, তখন আর তাহাতে উদাসীন না থাকিয়া তৎক্ষণাৎ নিবারণের ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য।

লক্ষণ—কোন কোন বালক বালিকার এরূপও দেখিতে পাওয়া যায়, রক্ত-স্রাবের পূর্ব্বে মাথাকামড়ানি, আবল্যভাব, শরীরে জড়তা প্রভৃতি লক্ষণ উপস্থিত হইয়া থাকে। এরূপ লক্ষণাক্রান্ত বালক বালিকার নাসিকা হইতে কিয়ৎপরিমাণ রক্ত-স্রাব হইলে তাহাদিগের ঐরূপ অসুস্থভাব ঘুচিয়া যায় এবং শরীর সুস্থ বোধ হয়।

নিবারণ উপায়—(১) একখানি ভিজা গামছা বা টুয়ালে অথবা নেকড়া পীঠের দিকে অর্থাৎ ঘাড়ের নীচে দুই কাঁধের মধ্যস্থলে স্থাপন করিয়া রোগীকে চীৎ করাইয়া খানিকক্ষণ শোওয়াইয়া রাখিলে রক্ত পড়া বন্ধ হয়।

(২) শীতল জলে গামছা ভিজাইয়া তাহা অল্প নিংড়াইয়া নাকে ও কপালে বুলাইতে হইবে ও দুই হাত শীতল জলে ডুবাইয়া রাখিতে হইবে এবং একটী বোতল অথবা ঘটিতে গরম জল পূরিয়া দুই পায়ের তলায় উহা স্পর্শ করাইতে হইবে।

(৩) কোন কোন সময় পীঠের উপর, অর্থাৎ ঘাড়ের নীচে দিয়া একটা চাবিকাটি দুই চারিবার গড়াইয়া ফেলিয়া

দিলেও উপকার হইয়া থাকে। উহা যেন পীঠের দাঁড়ার উপর দিয়া মাটিতে আসিয়া পড়ে।

(৪) এক টুক্‌রা বরফ অভাবে শীতল জল রোগীর নাকের উপর ও ভিতরে দিতে হইবে।

(৫) রোগীর মাথা একটু উঁচু করিয়া শোয়াইয়া রাখিলেও নিবারণ হইয়া থাকে।

(৬) সরলভাবে রোগীর দুই হাত দুই কাণের পার্শ্ব দিয়া উপরে তুলিয়া আবার দুই হাতের আঙুলে দুই কনুই ধরিয়া রাখিতে হইবে, ইহাও একটী নিবারণের উপায়।

(৭) এক মুঠা দূর্ব্বা ঘাস ছেঁচিয়া তাহার রস নাস লইলেও রক্ত বন্ধ হইয়া থাকে। যাহারা নাস লইতে অক্ষম, তাহাদিগের নাকের ভিতর পিচকারী দ্বারা উহা প্রবেশ করাই দিতে হইবে।

(৮) গাঁদা ফুলের পাতার রস নাস লইলেও রক্ত-স্রাব নিবারিত হইয়া থাকে।

(৯) একটু পরিষ্কৃত ভিজা তুলাতে এক খি সূতা বাঁধিয়া আঙুলের অগ্রভাগ করিয়া ঐ তুলা যে নাক দিয়া রক্ত পড়িতে থাকে, তাহার মধ্যে প্রবেশ করাইয়া রক্তপড়া বন্ধ হওয়া পর্য্যন্ত রাখিতে হইবে এবং উহা রহিত হইলে, সেই সূতাগাছটী ধরিয়া আস্তে আস্তে তুলা বাহির করিয়া লইতে হইবে।

(১০) ফট্‌কিরি খিচ-শূন্যভাবে গুঁড়া করিয়া সেই গুঁড়া একটী ভিজা সলিতায় মাখাইয়া রক্তস্রাব পথে বারম্বার দিতে থাকিলে শীঘ্রই উহা বন্ধ হইয়া থাকে।

(১১) শীতল জলে সির্কা (ভিনিগার) মিশাইয়া সেই জলের নাস লইলে এবং উহা দ্বারা কপাল, নাক ও ঘাড় ধুইলেও নিবারণ হয়।

(১২) কোন কোন সময়ে রক্তস্রাবকালে নাক টিপিয়া রাখিলেও রক্ত-রোধ হইয়া যায়।

রক্ত-স্রাবের সময় যে গৃহে রোগী অবস্থিতি করে, তথায় অধিক লোক উপস্থিক থাকিলে গৃহ গরম হইয়া রোগীর অপকার হইবার সম্ভব, এজন্য গৃহে অধিক লোক না রাখিয়া চারিদিকের দ্বার ও জানালা খুলিয়া দিয়া বায়ু সঞ্চার করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য।

পূর্ব্ব সাবধানতা—যে সকল বালক ও বালিকাদিগের নাসিকা হইতে মধ্যে মধ্যে ঐরূপ রক্ত-স্রাব হইয়া থাকে, গৃহস্থগণের উচিত প্রতিদিন প্রাতে বালকগণ শয্যা হইতে উঠিলেই ভিজা গামছা দ্বারা তাহাদিগের গাত্র মার্জ্জন করিয়া দিবেন। প্রাতে এবং সন্ধ্যার পূর্ব্বে পরিষ্কৃত বায়ু সঞ্চালিত স্থানে তাহাদিগকে ভ্রমণ ও ক্রীড়া করিবার ব্যবস্থা করিবেন। আর স্নানের সময় জলে অল্প পরিমাণ লবণ মিশ্রিত করিয়া সেই জলে বালক ও বালিকাদিগকে স্নান করাইবেন।

কখন কখন প্রাপ্ত বয়স্ক স্ত্রী ও পুরুষদিগের মধ্যেও এই পীড়া হইয়া থাকে; অতএব উপরি লিখিত ব্যবস্থা তাঁহাদিগের পক্ষেও অবলম্বনীয়।

রক্ত-স্রাব নিবারণ করিতে যে সকল উপায় লিখিত হইল, ঐ সকল অবলম্বন করিয়া যদি রক্ত-স্রাব নিবারিত না হয়, তবে উপযুক্ত চিকিৎসকের উপদেশানুসারে চিকিৎসা করাইতে ঔদাস্য করা উচিত নহে।

ভীমরুল ও মৌমাছি প্রভৃতির দংশন।

মৌমাছি, ভীমরুল বোল্‌তা প্রভৃতি দংশন করিবার সময় হুল ফুটাইয়া দেয়। যে স্থানে হুল ফুটাইয়া দেয়, সেই স্থান লাল হইয়া ফুলিয়া উঠে এবং জ্বালা করিতে থাকে। অল্প ক্ষণ জ্বালা করিয়া আপনা হইতেই নিবারণ হয়। কখন কখন আবার এরূপও দেখা যায়, উহার তাড়সে সামান্য জ্বরও হইয়া থাকে।

বিষাক্ত কীট পতঙ্গ শিশুদিগকে দংশন করিলে অত্যন্ত আতনাদায়ক হইয়া উঠে। কীট পতঙ্গাদির মধ্যে ভীমরুল দংশনই সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ানক যন্ত্রণা-জনক। কীট পতঙ্গ সহজে কাহাকেও দংশন করে না। তবে কোন প্রকারে উহাদিগকে উত্তেজিত করিলে দংশন করিতে ছাড়ে না।

বোল্‌তা মৌমাছি প্রভৃতি যে হুল ফুটাইয়া দেয়, তাহা বিষাক্ত। বিষাক্ত হুল শরীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেই জ্বালা করিতে থাকে। ঐ হুল অতি সূক্ষ্ম কাঁটার ন্যায়। যে স্থানে হুল প্রবিষ্ট হয়, অবিলম্বে সেই স্থান হইতে উহা তুলিয়া ফেলা আবশ্যক। হুল তুলিবার একটী সহজ উপায় আছে; অর্থাৎ যে স্থানে হুল প্রবিষ্ট হয়, সেই স্থানটী দুইটী আঙ্গুল দিয়া এরূপ নিয়মে টিপিয়া ধরিতে হইবে যেন সেই স্থানে আর রক্ত চলিতে না পারে। এখন ছুরির অগ্রভাগ কিম্বা চিম্‌টা দ্বারা উহা তুলিয়া ফেলিবে; হুল তুলিলে যন্ত্রণা নিবারণ হইয়া থাকে। হুল তুলার পর ঐ স্থান হইতে দুই এক বিন্দু রক্ত বাহির করিলে আর কোন প্রকার আশঙ্কা থাকে না। অনন্তর দষ্ট স্থানে গুড়, চিনি কিম্বা মধু লাগাইয়া দিলে নিশ্চয়ই জ্বালা যন্ত্রণা আরাম হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন লেভেণ্ডার, ওডিকলম কিম্বা বরফ দষ্ট স্থানে প্রয়োগ করিলেও বিশেষরূপ উপকার হইতে দেখা যায়।

কখন কখন এরূপও দেখা যায় হুল তুলিতে না পারিলে সেই স্থান অত্যন্ত ফুলিয়া উঠে এবং লাল বর্ণ হয়। কুচ্‌কি ও বগলে বিচি নামিয়া থাকে এবং তজ্জন্য জ্বরও হয়। এরূপ অবস্থা ঘটিলে চিকিৎসকের সাহায্য লওয়া অতীব আবশ্যক।

কীট পতঙ্গাদির দংশনে কখন কখন দষ্ট স্থান পাকিয়া উঠে ও পূঁজ জমিয়া থাকে।

আমরা যে সকল পিপীলিকা দেখিতে পাই তন্মধ্যে কতক-গুলি বিষাক্ত; বিষাক্ত পিপীলিকার দংশনে জ্বালা করিতে থাকে এবং দষ্ট স্থানের চারি ধার লাল হইয়া ফুলিয়া উঠে। বিশেষতঃ চোকের পাতায়, ওষ্ঠে দংশন করিলে দুই তিন দিন পর্য্যন্ত ফুলা থাকে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, যে, সকল জাতীয় পিপীলিকার দংশন যন্ত্রণা-দায়ক নহে। বিষাক্ত পিপীলিকার দংশনই যন্ত্রণা-দায়ক। যে একজাতীয় লম্বা আকৃতি-বিশিষ্ট পিপীলিকা কাঠে থাকে, সেই জাতীয় পিপীলিকার দংশন বড় ভয়ানক। যন্ত্রণায় অস্থির করিয়া তুলে।

পিপীলিকা-দংশন-জনিত-জ্বালা নিবারণ পক্ষে তার্পিণ তৈল অত্যন্ত উপকারী। দষ্ট স্থানে উহা লাগাইয়া দিলে তৎক্ষণাৎ জ্বালা নিবারণ হয়। জলের সহিত মধু মিশ্রিত করিয়া লাগাইলেও উপকার হইয়া থাকে।

সোঁয়াপোকা।—সোঁয়াপোকার লোমই বিষাক্ত। এই পোকায় দংশন করে না। উহার গাত্রে কোন প্রকারে অঙ্গ স্পর্শ হইলেই তৎক্ষণাৎ সেই স্থানে উহা ফুটিয়া যায়। এই লোম তুলিয়া না ফেলিলে সেই স্থানে ক্ষত অর্থাৎ ঘা হইতে পারে।

বর্ষাকালেই এই পোকার অত্যন্ত উৎপাত হইতে দেখা যায়। অতএব ঐ সময় বিশেষরূপ সতর্ক হওয়া আবশ্যক। পানীয় কিম্বা খাদ্যাদিতে যেন কোন প্রকারে

সোঁয়াপোকার লোম না পড়িতে পারে তাহাতে যত্নবান হওয়া উচিত। কারণ উহা উদরে প্রবিষ্ট হইলে গুরুতর বিপদের কথা। কখন কখন চক্ষে লোম ফুটিয়া কেহ কেহ চক্ষু রত্ন হারাইয়াছেন, এরূপও শুনা গিয়াছে।

সোঁয়াপোকার লোম গুলি তুলিয়া ফেলাই উহার প্রধান ঔষধ। ডুমুর, শসা কিম্বা কচুপাতা আস্তে আস্তে রগড়াইলে লোম গুলি উঠিয়া যায়। লোম বিদ্ধ স্থানে তৈল কিম্বা ধুনার গুঁড়া মাখাইয়া একখানি ছুরি অল্প গরম করিয়া রগড়াইলেও উহা উঠিতে পারে। এবং সেই স্থানে একটু চুণ লেপিয়া দিলেও উপকার হইয়া থাকে।

বিছা দংশন।

এ দেশে যে কয়েক প্রকার বিছা দেখা যায়, তন্মধ্যে কাঁকড়া ও তেঁতুলে বিছার বিষ অত্যন্ত ভয়ানক। কখন কখন উহাদিগের দংশনে মৃত্যু পর্য্যন্তও ঘটিয়া থাকে। শীতপ্রধান দেশ অপেক্ষা গ্রীষ্ম প্রধান দেশেই বিছার অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব।

যে সকল বিছা বিষাক্ত তাহাদিগের দংশন যন্ত্রণা-দায়ক। বিষাক্ত বিছা দংশন করিবামাত্রই অত্যন্ত জ্বলিতে থাকে। ঔষধ ব্যবহার ভিন্ন কিছুতেই জ্বালা নিবারণ হয় না। যন্ত্র-

শায় অস্থির করিয়া তুলে; কখন কখন দষ্ট ব্যক্তিকে বমনও করিতে দেখা যায়। আবার দষ্ট স্থানে ক্ষত হইয়া কখন কখন রোগীর যার-পর-নাই যন্ত্রণা কিম্বা মৃত্যু ঘটাইয়া থাকে।

সকল জাতীয় বিছার আকার একরূপ নহে; ইহারা সচরাচর ছয় হইতে দশ ইঞ্চ পর্য্যন্ত বড় হইয়া থাকে।

পুরাতন গৃহ এবং অপরিষ্কৃত স্থান সমূহে অধিক পরিমাণে বিছা দেখা যায়। গ্রীষ্মকালে ঘাম খাইতে শয্যার বিছা আসিয়া থাকে। স্যাঁতা স্থানেও বিছার প্রাদুর্ভাব দেখা যায়।

গ্রীষ্মকালে সর্ব্বদা বিছানা পরিষ্কার রাখা আবশ্যক। অন্ধকার স্থান সমূহে আলো লইয়া গমনাগমন করা উচিত। শয়নকালে শয্যার চারিধারে ভাল করিয়া মশারি গুঁজিয়া শয়ন করিলে বিছার দংশন হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়।

ফলতঃ সামান্যমাত্র সাবধানতা অবলম্বন করিলে এই শত্রুর দংশন হইতে রক্ষা পাওয়া যাইতে পারে।

বিষাক্ত প্রাণিগণ দংশন করিলেই যে যন্ত্রণা হইয়া থাকে এরূপ নহে, যে দংশনে রক্তের সহিত বিষ মিশ্রিত হয়; সেই দংশনই ভয়ানক। এজন্য কোন জাতীয় বিষাক্ত প্রাণী দংশন করিলেই তৎক্ষণাৎ দষ্ট স্থান হইতে রক্ত বাহির করিবার চেষ্টা করা উচিত। কারণ তদ্দ্বারা রক্তের সহিত বিষ নির্গত হইয়া যায়। যে নিয়মে রক্ত বাহির করিতে হয় নিম্নে তাহা লিখিত হইল।

শরীরের মধ্যে যে স্থানে বিছায় দংশন করে সেই দষ্ট স্থানের উপরিভাগে রজ্জু কিম্বা বস্ত্র দ্বারা এরূপ আঁটিয়া বাঁধিবে যেন উপরের দিকে আর রক্তের চলাচল না হইতে পারে। এখন দষ্ট স্থান ছুরি দ্বারা চিরিয়া দিবে। এবং উপরিভাগ অর্থাৎ বন্ধনের নীচে হইতে চুঁচিতে থাকিবে। অথবা ক্ষত স্থানে গরম জল ঢালিতে থাকিবে। ইহাতে সহজেই রক্তের সহিত বিষ নির্গত হইয়া আসিবে। আর যদি নিকটে ডাক্তারখানা থাকে, তবে তথা হইতে হয় কার্ব্বলিক এসিড্ কিম্বা লিউনার কষ্টিক্ নামক ঔষধ আনয়ন করিয়া ক্ষত স্থানে প্রয়োগ করিয়া বন্ধন খুলিয়া দিবে।

বিছার বিষ নষ্ট করিবার জন্য এ দেশে নানা প্রকার ঔষধ ব্যবহার হইয়া থাকে। পাঠকগণের অবগতির জন্য নিম্নে তৎসমুদয় লিখিত হইল।

(ক) আফিঙ্ ও মধু এক সঙ্গে মিশাইয়া দষ্ট স্থানে লাগাইবে।

(খ) আপাঙ্গের শিকড় বাটিয়া দষ্ট স্থানে প্রলেপ দিবে।

(গ) আমরুল শাক বাটিয়া প্রলেপ দিবে।

(ঘ) শ্বেত আকন্দের মূল বাটিয়া প্রলেপ দিবে।

(ঙ) শ্বেত করবীর কিম্বা শ্বেত জবার মূলের প্রলেপ দিবে।

(চ) যে বিছায় দংশন করে সেই বিছা থেঁতলাইয়া দষ্ট স্থানে লাগাইবে।

(ছ) তালপাতা ভস্ম দষ্ট স্থানে প্রলেপ দিবে।

(জ) হুঁকার জলের সহিত তামাকের পাতা বাটিয়া প্রলেপ দিবে।

(ঝ) দেশী আমড়ার পাতা বাটিয়া প্রলেপ দিবে।

(ঞ) মধুর সহিত শুড়ুক তামাকের প্রলেপ দিবে।

(ট) চিটা গুড় কিম্বা মধু দষ্ট স্থানে লেপিয়া দিবে।

(ঠ) চিনের বাদাম অথবা তেঁতুল বীজের শাঁস বাটিয়া প্রলেপ দিবে।

(ড) পাথরকুচির পাতা বাটিয়া প্রলেপ দিবে।

(ঢ) বিলাতী দেশলাইয়ের মাথা অর্থাৎ যাহা ঘসিলে জ্বলিয়া উঠে, সেইগুলি ভাঙ্গিয়া অল্প পরিমাণ জলে গুলিবে। অনন্তর তাহা গরম করিয়া দষ্ট স্থানে প্রলেপ দিবে।

(ণ) নূতন সরা কিম্বা পোড়া মাটি অল্প জলে পাথরে ঘসিয়া দষ্ট স্থানে দিবে।

(ত) কাঁটানটের শিকড় মধুর সহিত বাটিয়া প্রলেপ দিবে।

(থ) নড় গাছের শিকড়ের প্রলেপ দিবে।

(দ) দষ্ট স্থানে তৈল লাগাইলে তৎক্ষণাৎ জ্বালা নিবারিত হইয়া থাকে।

ক্ষিপ্ত কুক্কুর ও শৃগালাদির দংশন।

সর্প বিষের ন্যায় ক্ষিপ্ত শৃগালাদির দংশন-জনিত বিষ প্রাণ-নাশক। তবে প্রভেদের মধ্যে সর্প বিষে অল্প সময়ের মধ্যে মৃত্যু উপস্থিত হইয়া থাকে। কিন্তু ক্ষিপ্ত কুক্কুর শৃগালাদির দংশনে বিলম্বে মৃত্যু হইতে দেখা যায়। ক্ষিপ্ত কুক্কুর শৃগালাদির দংশনে যে এক প্রকার রোগ উৎপন্ন হয় তাহাকে হাইড্রোফোপিয়া অর্থাৎ জলাতঙ্ক রোগ কহে। হিংস্র জন্তুদিগের মধ্যেই এই রোগোৎপাদক বিষের আক্রমণ দেখিতে পাওয়া যায়। অর্থাৎ কুক্কুর, শৃগাল, বিড়াল, নেকড়িয়া বাঘ প্রভৃতি জন্তুদিগের এই ভয়ানক রোগ হইয়া থাকে। কিন্তু সিংহ ব্যাঘ্র প্রভৃতি জন্তুদিগের এ ভয়ানক রোগ দেখা যায় না।

কখন কখন দেখা যায় বানর ও ইঁদুর প্রভৃতি জন্তুদিগের দংশনেও জলাতঙ্ক রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

বহু পরীক্ষা দ্বারা সপ্রমাণ হইয়াছে, স্ত্রীজাতি অপেক্ষা পুংজাতীয় কুক্কুরের অধিক হইয়া থাকে।

কুক্কুরের জলাতঙ্ক রোগে অর্থাৎ কুক্কুর ক্ষিপ্ত হইলে রোগের অবস্থা লক্ষিত হয়। অর্থাৎ প্রথম অবস্থায় বিষণ্ণ ও মৌন হয়। কখন বা কিছুক্ষণ স্থির থাকিয়া চমকাইয়া উঠে এবং চতুর্দ্দিকে ছুটাছুটী করিতে থাকে। দ্বিতীয় অবস্থায় রাগান্বিত ও উন্মত্ত হইয়া উঠে। তৃতীয় বা শেষ অবস্থায় সম্পূর্ণ অবসন্ন হইয়া পড়ে।

পালিত কুক্কুর ক্ষিপ্ত হইলে প্রায় দেখা যায় গৃহ মধ্যে খাট, পালঙ্ক এবং চৌকি প্রভৃতির নীচে দৌড়াদৌড়ি করিতে থাকে। কখন বা বস্ত্রাদি ছিঁড়িতে থাকে; কখন বা লাফাইয়া লাফাইয়া মাছি ধরিতে আরম্ভ করে, ; দৃষ্টি নিম্ন-দিকে থাকে। এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হইলেই বিশেষরূপ সতর্ক হওয়া উচিত। ক্ষিপ্ত ভাব আরম্ভ হইলেই কুকুরকে বাঁধিয়া রাখা আবশ্যক। বালক বালিকাদিগকে নিকটে গমন করিতে দেওয়া অবিধেয়।

ক্ষিপ্ত কুকুরে কামড়াইলে কিম্বা কোন অঙ্গে ছাল উঠা স্থানে চাটিলে জলাতঙ্ক রোগ উপস্থিত হইতে পারে। এই ভয়ানক রোগ উপস্থিত হইলে প্রথমে অসহ্য যন্ত্রণা পরিশেষে মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। অতএব এই ভয়ানক প্রাণনাশক বিষ যাহাতে শরীরে প্রবিষ্ট হইতে না পারে তদ্বিষয়ে সাবধান হওয়া সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। মোটা কাপড়ে গাত্র আচ্ছাদিত থাকিলে ক্ষিপ্ত কুকুরের দংশনে তত আশঙ্কা থাকে না। কারণ দংশন সময়ে কুকুরের মুখ-ক্ষরিত বিষবৎ লালা শরীরে প্রবেশ করিতে পারে না। উহা বস্ত্রে লাগিয়া যায়। শৃগাল কুক্কুরাদির এই উন্মত্ততা রোগ উপস্থিত হইলে প্রায় অষ্টাহ জীবিত থাকে।

ক্ষিপ্ত কুকুরের দংশনে প্রায় বিয়াল্লিশ দিনের মধ্যেই জলাতঙ্ক রোগ উপস্থিত হইয়া থাকে। কিন্তু কখন দশ বার বৎসরের পরেও ইহাতে আক্রমণ করিয়া থাকে। কোন কোন বিচক্ষণ

চিকিৎসক উক্ত মতে বিশ্বাস করেন না। তাঁহারা বলেন এই-রূপ দীর্ঘকাল পরে যে রোগ উপস্থিত হয় তাহা বাস্তবিক ক্ষিপ্ত কুকুরের দংশন-জনিত নহে, অপরাপর কারণে তাহা উৎপন্ন হইয়া থাকে। অন্যান্য বিষাক্ত প্রাণিগণের দংশনে যেমন দংশনের সঙ্গে সঙ্গে রোগ যন্ত্রণা ও লক্ষণাদি উপস্থিত হয়, ক্ষিপ্ত কুকুরের দংশনে সেরূপ হয় না।

ক্ষিপ্ত কুক্কুরাদি-দংশিত ব্যক্তিগণের জলাতঙ্ক রোগ উপস্থিত হইলে প্রায়ই দেখা যায় রোগী সর্ব্বদা বিষণ্ন ও চিন্তাযুক্ত থাকে; গোলমাল ভালবাসে না; অন্যের নিকট স্বীয় অবস্থা প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করে না; তাহার সুনিদ্রা হয় না; ক্রোধের উদ্রেক হয়; এবং সে শ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট অনুভব করে, কখন কখন হাঁপাইতে থাকে; তাহার পেট বেদনা করে; এবং হিক্কা উঠিতে থাকে। মুখ ধুলার মত শুকাইয়া উঠে, জিহ্বাদি বিশুষ্ক এবং আটা আটা হয়, রোগী মুখ বিশুষ্কতাজনিত ভয়ানক যন্ত্রণার সহিত জিহ্বাদির সঞ্চালন ও মুখভঙ্গী করিতে থাকে; লোকে তদ্দর্শনে মনে করে রোগী ক্ষিপ্ত হইয়া দংশন করিতে চেষ্টা পাইতেছে। বাস্তবিক তাহা নহে। আর যখন ভালরূপ শ্বাস ক্রিয়া চলে না, রোগী এক প্রকার যাতনা-সূচক বিকট শব্দ করিতে থাকে, সেই শব্দ শুনিয়া লোকে মনে করিয়া থাকে, রোগী ক্ষিপ্ত হইয়া কুকুর-রব করিতেছে।

জলাতঙ্ক রোগের দ্বিতীয় অবস্থা আরও কষ্ট-কর। এই অবস্থায় নাড়ীর গতিক খারাপ হয়, বুকে অত্যন্ত বেদনা হইতে

থাকে, খিচুনি আরম্ভ হয় এবং রোগের যাহা প্রধান চিহ্ন—জল দেখিলে ভয় পাওয়া তাহা ঘটিয়া উঠে। জল দর্শন করিলেই রোগীর যার-পর-নাই আশঙ্কা হইতে থাকে। এমন কি পিপাসায় ছটফট্ করিতেছে কিন্তু জলপান করিতে পারে না। কোন কোন রোগী জল দর্শন কিম্বা স্পর্শ করিলে মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হয়। জলের ন্যায় অন্যান্য তরল পদার্থ তাহার পক্ষে ভয়-জনক। কিন্তু বরফ খাইতে কোন প্রকার ভয় পায় না।

জলাতঙ্ক রোগ যার-পর-নাই যন্ত্রণা-দায়ক; এই রোগে শেষ অবস্থা পর্য্যন্ত রোগীর জ্ঞানের লোপ হয় না। রোগীর শোচনীয় অবস্থা দর্শন করিলে বুক ফাটিয়া যায়। সে কোন অবস্থাতেই সুস্থ থাকে না। সর্ব্বদাই ভয়ানক যাতনা ভোগ করিতে থাকে। সর্ব্ব শরীর মলিন হয়, চোক মুখের অবস্থা ও কাতরতা দেখিলে সহজেই বুঝিতে পারা যায় রোগী অসহ্য কষ্ট ভোগ করিতেছে।

এই অবস্থায় রোগীর মনে নানা প্রকার অলীক আশঙ্কার সঞ্চার হয়। কোন প্রকার সামান্য শব্দ শুনিলেই রোগী ভীত হইয়া উঠে। শরীরে কিছু স্পর্শ হইলেই অমনি খিচুনি হইতে থাকে সে যেন সর্ব্বদাই ত্রাসিত।

জলাতঙ্ক রোগের তৃতীয় বা শেষ অবস্থা আরও শোচনীয়। এই অবস্থায় জলপানেচ্ছা যার-পর-নাই বলবতী হইয়া উঠে। মুখে গ্যাঁজলা ভাঙ্গিতে থাকে। স্বরভঙ্গ হইয়া আইসে। মুহুর্মুহু খিচুনি হইতে থাকে। শ্বাস প্রশ্বাসে

অত্যন্ত কষ্ট হয়। এমন কি পরিশেষে শ্বাস রোধ হইয়াই সমুদয় যাতনার হস্ত হইতে রোগী জন্মের মত পরিত্রাণ লাভ করে।

কোথাও আবার এইরূপ দেখা যায় যে, মৃত্যুর, পূর্ব্বে রোগী কিছু আহার করিয়া থাকে। তাহার যাতনাও উপশম হইয়া আইসে। এবং অল্পক্ষণ মধ্যে সে কাল-গ্রাসে পতিত হইয়া থাকে।

এই রোগে আক্রান্ত রোগীর মৃত্যু একরূপ নিয়মে ঘটে না। তবে চারিদিনের মধ্যে অনেকেরই মৃত্যু হইয়া থাকে। কেহ কেহ আবার ষোল হইতে চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে মৃত্যু-মুখে পতিত হয়। কোন কোন স্থলে এরূপও দেখা যায়, রোগী দুই তিন সপ্তাহ পর্য্যন্ত রোগ ভোগ করিয়া প্রাণ-ত্যাগ করিয়া থাকে।

দষ্ট স্থানের ক্ষত অধিক দিন পর্য্যন্ত শুকাইতে না দেওয়া ভাল। এজন্য উহা শুষ্ক হইলে চিরিয়া পুনর্ব্বার ক্ষত করা আবশ্যক। মটর ও শিমাদি বাটিয়া ক্ষত স্থানে প্রলেপ দিলে শীঘ্র ঘা শুকায় না। কিছুদিন পরে মলম দিলে উহা শুকাইয়া যায়। দষ্ট স্থানে পশুর দাঁত বসিলে কিম্বা রক্তস্রাব হইলে অথবা কেবলমাত্র ছাল উঠিলে শীতল জলের পটি দেওয়া আবশ্যক। জলাতঙ্ক রোগের উপযুক্ত ঔষধ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই।

ক্ষিপ্ত জন্তুতে দংশন করিলে তৎক্ষণাৎ তাহার উপরে

এরূপভাবে বন্ধন করিতে হয় যেন আর রক্ত চলাচল হইতে না পারে। অনন্তর দষ্ট স্থান চুষিয়া বিষ তুলিয়া ফেলা ভাল। যতদূর ব্যাপিয়া দংশন করে, ততদূর পর্য্যন্ত দাগ দিয়া কুরিয়া কাটিয়া ফেলিলে নির্ব্বিষ হইতে পারে। যে স্থানে দাঁত বসাইয়া দেয় সেই ছিদ্রে সরু শলা প্রবেশ করিয়া দিতে হয়, যখন দেখা যায় আর উহা প্রবেশ করিতে পারিতেছে না, তখন সেই পর্য্যন্ত মাংস কাটিয়া ফেলিবে, আঙ্গুলের অগ্রভাগে দংশন করিলে গোড়া কাটিয়া ফেলা সুযুক্তি।

ক্ষিপ্ত কুক্কুরাদির দংশনে ভীত না হইয়া সাহস অবলম্বন করা সৎপরামর্শ। শরীর ও মনের চালনা অধিক পরিমাণে ঘর্ম্ম নিঃসরণ করা সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম। এজন্য অনেকে দষ্ট ব্যক্তিকে ব্যায়াম করিতে পরামর্শ দিয়া থাকেন।

গ্রাম কিম্বা পল্লী মধ্যে ক্ষিপ্ত কুক্কুরাদি দেখিলে তৎক্ষণাৎ মারিয়া ফেলা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। ক্ষিপ্ত কুক্কুরাদি দেখিলেই তাহাদিগের উন্মত্ততা জানিতে পারা যায়। ক্ষেপার অবস্থায় তাহারা প্রায় এক স্থানে স্থির হইয়া থাকিতে পারে না এবং মুখব্যাদান করিয়া থাকে। মুখ হইতে লালা নির্গত হয়, দৃষ্টি বিকৃত হয়, লেজ ভাঙ্গিয়া পড়ে। এই সকল লক্ষণাক্রান্ত কুক্কুরাদি দেখিলেই সাবধান হওয়া উচিত। বিশেষতঃ বালক বালিকাদিগকে যদৃচ্ছভাবে গৃহের বাহিরে যাইতে দেওয়া কর্ত্তব্য নহে।

পশুর আক্রমণ।

পালিত ও বন্য পশুর আক্রমণেও বিস্তর অপঘাত-মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। কিন্তু একটু সাবধান হইলে যে, ঐ দুর্ঘটনা হইতে রক্ষা পাওয়া যায় তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। গৃহ পালিত গো, অশ্ব প্রভৃতি পশুদিগের নিকট সতর্কভাবে গমনা-গমন করা উচিত। যে সকল পালিত পশু হিংস্রক, বালক বালিকা-দিগকে তাহাদিগের নিকট যাইতে দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। গো, মহিষ প্রভৃতি পশুদিগের শৃঙ্গ মধ্যে মধ্যে কাটিয়া দেওয়া ভাল।

অশ্বের পশ্চাতে যাওয়া উচিত নহে। আরোহণ করি-বার সময় সম্মুখ দিয়া পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইলে কোন প্রকার বিপদের আশঙ্কা থাকে না। বিশেষতঃ অশিক্ষিত অশ্বের পশ্চাতে গমন করা কখনই কর্ত্তব্য নহে; কারণ কোন কোন অশ্বের এরূপ স্বভাব যে, পশ্চাতে গমন করিলে পদদ্বয় দ্বারা আঘাত করিয়া থাকে। এজন্য অশ্বের পশ্চাতে গমন করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

অশ্বারোহণে বিশেষরূপ সাবধান হওয়া আবশ্যক। কারণ সামান্যরূপ অসাবধানতা ঘটিলেই পতিত হইবার গুরুতর সম্ভব! বিশেষতঃ অশ্ব হঠাৎ ধাবিত হইলে, কিম্বা ধাবিত অশ্ব সহসা দণ্ডায়মান হইলে অশ্বারূঢ় ব্যক্তির পতিত হই-বার আশঙ্কা থাকে। অশ্ব সহসা ধাবিত হইলে পশ্চাৎ দিকে এবং ধাবিত অশ্ব হঠাৎ দণ্ডায়মান হইলে সম্মুখভাগে পতিত

হওয়ার সম্ভব। অশ্ব হইতে পতিত হইবার সূচনা দেখিলেই রেকাব হইতে পদদ্বয় খুলিয়া সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য। কারণ কোন কোন সময় দেখা যায়, অশ্বারূঢ় ব্যক্তির পদদ্বয় রেকাবিতে আবদ্ধ আছে, অশ্ব ধাবিত হইতেছে; এরূপ দুর্ঘটনায় অনেকের অপমৃত্যু হইয়া থাকে।

গৃহপালিত পশু ভিন্ন সময় সময় নানা প্রকার হিংস্র পশু দ্বারাও বৎসর বৎসর বিস্তর জীবন বিনষ্ট হইতে দেখা যায়। যে যে স্থানে হিংস্র জন্তুদিগের উপদ্রব, সেই সেই স্থানে সতত সতর্কভাবে অবস্থিতি করিতে হয়। অরণ্য চর-শ্বাপদগণ দিবাভাগে প্রায়ই অরণ্য মধ্যে অবস্থিতি করিয়া থাকে। সন্ধ্যার সময় তাহারা আহারান্বেষণে লোকালয়ের দিকে বিচরণ করে। এবং রাত্রি শেষ হইলে পুনর্ব্বার স্ব স্ব বাসস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে দেখা যায়। এজন্য রজনীর প্রথম ও শেষ ভাগেই বিশেষ আশঙ্কা।

জন্তুমাত্রেই অগ্নির অত্যন্ত ভয় করিয়া থাকে। ব্যাঘ্র যে এত হিংস্র পশু সেও প্রজ্জ্বলিত অগ্নি দেখিলে দূরে পলায়ন করে। অতএব রাত্রিকালে কোন স্থানে গমন করিতে হইলে এবং অরণ্যপশুর আশঙ্কা নিবারণ পক্ষে অগ্নি জ্বালিয়া যাওয়াই শ্রেয়স্কর।

সর্পাঘাত।

যত প্রকার জন্তুর বিষ আছে, তন্মধ্যে সর্পের বিষ অত্যন্ত ভয়ানক। এ পর্য্যন্ত সর্পবিষের যদিও সম্যক ঔষধ প্রকাশিত হয় নাই, কিন্তু সময়ে উপযুক্তরূপ চিকিৎসা করিলে এই ভীষণ বিষের বিপদ হইতে রক্ষা পাইতে পারা যায়।

এ দেশে যে সকল সর্প দেখা যায়, তন্মধ্যে সকলগুলি বিষাক্ত নহে। গোক্ষুরা এবং কেউটে প্রভৃতির তীব্র বিষে সচরাচর তিন ঘণ্টার মধ্যে মৃত্যু উপস্থিত হইয়া থাকে। অঙ্গ বিশেষে আবার সর্প দংশন আরও ভয়ানক বিপজ্জনক। বগলে, কুচ্‌কিতে, বক্ষঃস্থলে, গলদেশে, মুখমণ্ডলে এবং কাল শিরার উপর বিষাক্ত সর্প দংশন মৃত্যু-জনক।

গোক্ষুরা ও শঙ্খচূড় সর্প অপেক্ষা কেউটে সর্প অত্যন্ত ভয়ানক। অন্যান্য সর্প কোন প্রকারে উত্তেজিত না হইলে প্রায় দংশন করে না। কিন্তু কেউটে লোক দেখিলেই ছুটিয়া আসিয়া দংশন করিয়া থাকে।

প্রায়ই দেখা যায়, ফণাবিশিষ্ট সর্প সমূহই বিষাক্ত। ফণাহীন সর্পের মধ্যে অল্প সংখ্যক বিষধর। সর্প-দংশন নির্ণয় করিবার অর্থাৎ বিষধর কিম্বা বিষ-হীন সর্প-দংশন জানিবার একটি সহজ উপায় আছে। ফণা-বিশিষ্ট সর্পের দংশনে প্রায়ই দেখা যায় এক লাইনে এক বুরুল অন্তরে দন্তাঘাতের দাগ পড়িয়া থাকে। আর ফণাহীন সর্পের দংশনে উপরে ও নীচে গোলাকার দাগ দেখা যায়। এবং দষ্ট স্থান ঠাণ্ডা বোধ হয়।

এতদ্ভিন্ন আরও কতকগুলি লক্ষণ দ্বারা সর্পাঘাত জানিতে পারা যায়। সর্প-বিষ শরীরে প্রবিষ্ট হইলে যন্ত্রণায় রোগী অবসন্ন হইয়া পড়ে। নাড়ীর গতি মন্দ হইয়া আইসে। কখন কখন বমন, কখন কখন বা লাল নির্গত হইতে থাকে। নিশ্বাস প্রশ্বাস সঞ্চালন কষ্ট-কর হইয়া উঠে; কাহার কাহার তরল মল নির্গত হয়। কোন কোন সর্পাঘাতে দষ্টস্থান নীলবর্ণ হয় এবং দন্তের দাগ দেখা যায়।

ধসা বোড়া দংশন করিলে দষ্টস্থান অল্পক্ষণ পরে কাল বর্ণ হইয়া ফুলিয়া উঠে এবং রোগী কিয়দ্দিবস জীবিত থাকে; পরিশেষে উক্ত স্থানে ক্ষত হইয়া পচিতে আরম্ভ হয়। কালাচ সর্পে দংশন করিলে সর্ব্বাঙ্গে ভয়ানক বেদনা হইয়া থাকে।

সর্পে দংশন করিলেই প্রায় দেখা যায় দষ্ট ব্যক্তি জীবনের প্রতি হতাশ্বাস হইয়া থাকে। এজন্য রোগীকে বিশেষরূপ আশ্বাস দেওয়া উচিত।

যখন দেখা যাইবে সর্প-দংশনে রোগী জ্ঞান-শূন্য হইয়া ঢুলিয়া পড়িতেছে, কোন প্রকারে জ্ঞান-সঞ্চার হইতেছে না, তখন তাহার মস্তকে শীতল জল সেচন করিবে এবং একটী জয়পালের শাঁস থিচ-শূন্যভাবে বাটিয়া চোকের তারার উপর প্রলেপ দিবে। বিষাক্ত সর্পে দংশন করিবামাত্রই দষ্ট-স্থান কাটিয়া ফেলা ভাল।

দষ্ট-স্থান কাটিবার পূর্ব্বে আর একটী কার্য্য করিলে ভাল

হয়, অর্থাৎ যে স্থানে দংশন করিবে, তাহার কিছু উপরে অত্যন্ত কসিয়া বাঁধিতে হইবে। যদি সেই সময় হঠাৎ বাঁধিবার উপকরণ সংগ্রহ হইয়া না উঠে, তবে রুমাল কিম্বা কাপড়ের পাইড় বা ফালি ছিঁড়িয়া অথবা দড়ি প্রভৃতি যাহা পাওয়া যায়, তদ্দ্বারা বাঁধা প্রশস্ত। দংশনসময় হইতে এক মুহূর্ত্তও বৃথা নষ্ট করা উচিত নহে। এ দেশে সর্প চিকিৎসকগণ যে নিয়মে দষ্ট স্থান বাঁধিয়া থাকেন, তাহা অত্যন্ত উপকার-জনক। তাঁহারা দুইটী বন্ধন করিয়া থাকেন, অর্থাৎ প্রথমটী দষ্ট স্থানের কিছু উপরে দ্বিতীয় বন্ধন আবার তাহার কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধে। দুইটী বন্ধনের কারণ এই ঃ—প্রথম বন্ধনে যদি বিষ রক্তের সহিত মিশ্রিত হইয়া উপরে উঠিতে থাকে, এই আশঙ্কায় তাহার উপরে আবার আর একটী বন্ধন দিয়া থাকেন। বাস্তবিক সর্পবিষ যেরূপ প্রাণ-নাশক, তাহাতে ঐরূপ বন্ধন যার-পর-নাই দূরদর্শীতার কার্য্য। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, বন্ধন যত কসিয়া বাঁধা হয়, তাহাই উত্তম। এজন্য বন্ধন-রজ্জু প্রভৃতির মধ্যে একটী কাটি কিম্বা কোন রকম লম্বা গোছের একটী দণ্ড পরাইয়া পাক দিয়া লইলে ঐ বন্ধন অত্যন্ত আঁটিয়া বসিবে, কোন স্থানে একটুও শিথিল অর্থাৎ ঢিলা হইবে না। বন্ধন ঢিলা হইলে তাহার উদ্দেশ্য সাধিত হয় না।

দষ্ট-স্থান উল্লিখিতরূপে বন্ধন করিয়া কাটিয়া কিম্বা চুষিয়া বিষ বাহির করা ভাল। চুষা সম্বন্ধে একটী কথা মনে রাখা আবশ্যক, অর্থাৎ যাহাদের মুখের ভিতর ও দন্ত-মূল

প্রভৃতির কোন স্থানে ক্ষত থাকে কিম্বা যাহাদিগের পান্‌সে দাঁতও একটু জোর লাগিলেই দাঁতের গোড়া হইতে রক্ত পড়িয়া থাকে, এরূপ ব্যক্তির দ্বারা চুষাইতে দেওয়া কোনক্রমেই উচিত নহে। কারণ তদ্দ্বারা একটী বিপদ নিবারণ করিতে গিয়া আবার আর একটী নূতন বিপদ ডাকিয়া আনা হয়; অর্থাৎ দষ্টস্থানের বিষ চোষণকারীর শরীরে প্রবেশ করিয়া তাহার জীবন নষ্ট করিয়া তুলে।

চুষণ সময়ে তৈল মুখে করিয়া চুষিলে কোন অনিষ্টের আশঙ্কা থাকে না অথবা একটু ব্রাণ্ডি জল মুখে কুলি করিয়া চোষণ করা ভাল এবং চোষণের পরই মুখের মধ্যস্থ রসাদি ফেলিয়া দিয়া পূর্ব্ববৎ ব্রাণ্ডিজলে মুখ ধৌত করা কর্ত্তব্য। ব্রাণ্ডি অভাবে কেবলমাত্র জল দ্বারা ধৌত কার্য্য চলিতে পারে। এইরূপভাবে চুষিতে চুষিতে যখন দেখা যাইবে যে, বিষ নির্গত হইয়াছে তখন আর চুষিবার প্রয়োজন হয় না।

চোষণ-সম্বন্ধে আর একটী সহজ উপায় আছে, এস্থলে তাহাও জানিয়া রাখা প্রত্যেক গৃহস্থের পক্ষেই প্রয়োজন। দষ্টস্থানে কোন পাত্রে একটী বাতি অথবা সলিতা জ্বালিয়া তাহার উপর একটী খালি গ্লাস্ উপুড় করিয়া রাখিলে ঐ গ্লাস অত্যন্ত আঁটিয়া বসিবে এবং রক্তস্থ বিষাক্ত অংশ টানিয়া বাহির করিতে থাকিবে। গ্লাসটী কাচের হইলেই ভাল হয়; কারণ কাচ অত্যন্ত স্বচ্ছ, সুতরাং বাহির হইতেই বেশ দেখা যায় কি পরিমাণে রক্তাদি নির্গত হইয়া আসিতেছে।

বিষ রক্তের সহিত মিশ্রিত হইয়া যাহাতে সর্ব্বাঙ্গে সঞ্চারিত হইতে না পারে, তাহার প্রতিবিধান করাই সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। এজন্য অগ্রে বন্ধন করাই যুক্তিসিদ্ধ। বন্ধনের পর দষ্ট-স্থান চোষণ কিম্বা কর্ত্তন করাই পরামর্শ। কাটিতে কোন প্রকার আশঙ্কা না করাই বুদ্ধিমানের কাজ। কারণ জীবন নষ্ট অপেক্ষা দষ্ট স্থান কাটিয়া দেওয়া তত হানিজনক নহে। ধারাল ছুরি, ক্ষুর প্রভৃতি অস্ত্র দ্বারা দষ্ট-স্থান চিরিয়া দিতে হয়। চিরিয়া দিলে সেই স্থান হইতে রক্ত নির্গত হইতে থাকে এবং সেই সঙ্গে বিষও বাহিরে আইসে। চিরার উপরের দিক হইতে চুঁচিয়া আনিলে রক্ত নির্গত হইবার সহায়তা হইয়া থাকে। কর্ত্তিত স্থানের উপর গরম জলের ধারাণী করিলেও রক্ত নির্গত হয়। কেবলমাত্র চিরিয়াই নিশ্চিন্ত থাকা উচিত নহে। দষ্ট-স্থান উত্তমরূপে পুড়াইয়া দেওয়াও একটী প্রধান চিকিৎসা। এক ড্রামকাষ্টিক জলে গুলিয়া ক্ষত স্থান উত্তমরূপে ধুইয়া দেওয়া আবশ্যক।

দষ্ট-স্থানের উপর যে বন্ধন দেওয়া হয়, তাহা সহসা খুলিয়া দেওয়া উচিত নহে। যখন দেখা যাইবে দষ্ট-স্থান এবং তাহার চারি পার্শ্বস্থ চিরাস্থান সমূহ হইতে পরিষ্কার রক্ত নির্গত হইতেছে এবং বিষের যন্ত্রণা রোগী আর অনুভব করিতে পারিতেছে না, তখন ঐ বন্ধন মোচন করা আবশ্যক।

বিষাক্ত হইলে রক্ত কৃষ্ণবর্ণ হয়। তাহার স্বাভাবিক বর্ণ থাকে না। অতএব যে পর্য্যন্ত এরূপ দূষিত রক্ত দেখা যাইবে,

সে পর্য্যন্ত চিকিৎসায় ত্রুটি করা কখনই কর্ত্তব্য নহে। অর্থাৎ দষ্ট-স্থান হইতে রক্ত নির্গত করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। কেহ কেহ কর্ত্তিত স্থানের উপর হইতে লবণ দিয়াও চুঁচিয়া থাকেন।

আভ্যন্তরিক চিকিৎসা।—দষ্ট ব্যক্তি যদি বিষের জ্বালায় দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, তবে অবিলম্বে তাহাকে বল-কারক ঔষধ সেবন করাইতে হইবে। গরম্ জলে অল্প পরিমাণ ব্রাণ্ডি দিয়া মধ্যে মধ্যে সেবন করিতে দেওয়া ভাল। অথবা কুড়ি ফোটা লাইকর এমোনিয়া গরম জলের সঙ্গে সেবন করাইতে হইবে। এই সকল সেবন করাইলে রোগী অপেক্ষাকৃত সবল হইবে। রোগীর যদি বমন না হয়, তবে গরম জলের সঙ্গে রাইসরিষার গুঁড়া (মষ্টার্ড) সেবন ব্যবস্থা। ইহা সেবন করিলে বমন উদ্রেক হইবে। আর যদি আপনা হইতে অধিক বমি হইতে থাকে এবং তদ্দ্বারা রোগী দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, তবে একখানি বড় রাইসরিষার পটি পেটে বসাইতে হইবে কিন্তু বমন বন্ধ হইলে তাহা তুলিয়া ফেলা আবশ্যক।

ঐ পটিতে যদি বমন বন্ধ না হয়, তবে আধ রতি আফিং খাওয়াইলে তাহা থামিয়া যাইবে। আফিঃ এক বারের অধিক সেবন করা অবিধেয়। এই সকল উপায়ে যদি উপকার না হয়, তবে উপযুক্ত চিকিৎসকের সাহায্য লওয়া সুপরামর্শ।

সর্পে দংশন করিলেই বুঝিতে পারা যায় তাহা বিষাক্ত সর্প কি না। বিষাক্ত সর্পে দংশন করিলে দংশিত স্থানে অত্যন্ত

বেদনা হয়, শীঘ্র সেই স্থান ফুলিয়া উঠে, চক্‌চক্ করিতে থাকে; রোগী যদি অধিকক্ষণ জীবিত থাকে, তবে সে স্থানে রস জমে এবং পচিয়া উঠে, অত্যন্ত দৌর্ব্বল্য হয়, নাড়ী দ্রুত হয়, বাক রহিত হইয়া আইসে, কখন কখন প্রলাপ বকিতে থাকে, বিষের যন্ত্রণায় অস্থির হয়, শরীর বিবর্ণ হয়, মুখে ফেণা ভাঙিতে থাকে, অজ্ঞান হইয়া পড়ে, হাত পা এবং ঘাড় নেতাইয়া পড়ে, অবশেষে মৃত্যু উপস্থিত হইয়া রোগীর সকল যন্ত্রণা অবসান করে।

বিষাক্ত সর্পের বিষ দ্রুতবেগে সর্ব্ব শরীরে সঞ্চার হয়, এজন্য দংশনমাত্রেই চিকিৎসা করা উচিত।

পূর্ব্বে চিকিৎসা সম্বন্ধে যে সকল বিষয় উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা প্রত্যেক গৃহস্থেরই জানিয়া রাখা আবশ্যক। সর্প চিকিৎসা বিষয়ে এ দেশের মাল বৈদ্যগণ অনেক প্রকার উত্তমোত্তম ঔষধ অবগত আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, তাহারা প্রায় কাহারও নিকট তাহা প্রকাশ করে না। অনেক প্রকার গাছ গাছড়া আছে, সেই সকল দ্বারা বিষ নাশ হইয়া থাকে। দষ্ট ব্যক্তিকে লঙ্কাপাতা খাওয়াইলে উপকার হইয়া থাকে। রোগীকে ঘুমাইতে দেওয়া উচিত নহে।

সর্প যেরূপ ভয়ানক শত্রু, তাহার আক্রমণ হইতে সাবধানে থাকাই প্রত্যেক গৃহস্থের পক্ষে গুরুতর কর্ত্তব্য।

সর্পবিষের ঔষধ।—বেলের শিকড় বাটিয়া খাওয়াইলে বিষ নষ্ট হইয়া থাকে।

মোনসা গাছের আটা দংশিত স্থানে প্রলেপ দিবে। এবং আধ ছটাক হইতে এক ছটাক পাতার রস রোগীকে সেবন করাইবে।

শ্বেত করবীর শিকড় বাটিয়া রোগীকে সেবন করাইবে। অথবা টগর ফুলের শিকড় শ্বেত করবীর শিকড়ের সহিত বাটিয়া সেবন করাইবে। কিম্বা গোলমরিচের সহিত টগর ফুলের শিকড় বাটিয়া সেবন করিতে দিবে।

ঘলঘোসা বা হলকোসা নামক গাছের পাতার রস আধ পোয়া হইতে এক পোয়া পর্য্যন্ত সেবন করাইবে। রোগী সেবন করিতে অশক্ত হইলে নাসা-পথে পিচকারী দিবে। এবং রোগীর সর্ব্বাঙ্গে দলিয়া দলিয়া মাখাইয়া দিবে।

কার্পাস পাতার রস আধ ছটাক হইতে দেড় ছটাক পর্য্যন্ত সেবন করিতে দিবে। এবং দষ্ট স্থলে পাতা বাটিয়া প্রলেপ দিবে।

আমরুল শাকের রস আধ কাঁচ্চা হইতে এক কাঁচ্চা পর্য্যন্ত সেবন করিতে দিবে। আর দষ্ট স্থানে উহার রস প্রয়োগ করিবে।

কৃষ্ণ তুলসীর শিকড় বাটা পাঁচ ছয় কুঁচ পরিমাণ সেবন করাইবে এবং দষ্ট স্থানে উহার প্রলেপ দিবে।

শ্বেত আকন্দের মূল বাটিয়া দষ্ট স্থানে প্রলেপ ও সেবন করিলে সর্প বিষ নষ্ট হইতে পারে।

আফুলা নিমের শিকড় বিষঘ্ন।

বোড়িয়ালার মূল বিষ-নাশক।

আধ কাঁচ্চা হইতে আধ ছটাক পরিমাণ সাদা জবার শিকড় গোলমরিচের সহিত বাটিয়া সেবন করাইলে সর্প বিষ নষ্ট হইয়া থাকে।

গোয়ালে লতা বাটিয়া দষ্ট স্থানে প্রলেপ দিবে।

হাতিশুঁড়োর মূল বাটিয়া সেবন করাইবে।

আদা অথবা শুঁটের সহিত নির্বিষ গাছের পাতা বাঁটিয়া সেবন করাইবে।

লঙ্কা মরিচের শিকড় বাটিয়া সেবন করাইলে বিষ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

আফুলা মাদারের শিকড় বিষঘ্ন।

একটী পিপুলের সহিত মুথার মূল বাটিয়া দষ্ট স্থানে প্রলেপ ও সেবনের ব্যবস্থা করিলে উপকার হইয়া থাকে।

এক তোলা তামাকের পাতা ও মূল হুঁকার জলের সহিত বাটিয়া সেবন করিতে দিবে।

কালমেঘ নামক গাছের রস দেড় চটাক হইতে দুই ছটাক পর্য্যন্ত সেবন করাইবে এবং দুষ্ট ব্যক্তির সর্ব্বাঙ্গে উহা দলিয়া দলিয়া মাখাইবে।

এক তোলা বন আদার মুল বাটিয়া সেবন করাইবে এবং দষ্ট স্থানে উহার প্রলেপ দিলেও বিষ নষ্ট হইয়া থাকে।

কাঁটানটের রস সর্প দষ্ট ব্যক্তির সর্ব্বাঙ্গে মাখাইবে। রোগীর অবস্থা বুঝিয়া এক হইতে দেড় ছটাক পর্য্যন্ত সেবন করিতে দিবে।

কাঁটানটের ন্যায় সজিনার ছাল ব্যবহার করিতে দিবে।

আফুলা শিমুলের মূল (এক হইতে তিন তোলা) বাটিয়া রোগীকে সেবন করাইবে এবং দষ্ট স্থানে প্রলেপ দিবে।

দষ্ট স্থানে বাকসের শিকড় বাটিয়া প্রলেপ দিবে। এবং দুই তোলা পিপুলের সহিত উক্ত গাছের ছাল বাটিয়া জলের সহিত মিশাইবে। পরে সেই জল দষ্ট ব্যক্তিকে পান করিতে দিবে।

ভূঁমি কুমড়া জল দিয়া ঘাটিয়া রোগীকে সেবন করাইলে এবং দষ্ট স্থানে প্রলেপ দিলে উপকার হইয়া থাকে।

এক ছটাক জলে আধ ছটাক ফটকিরি গুলিয়া রোগীকে সেবন করাইলে ভেদ ও বমন হইয়া বিষ নষ্ট হইয়া থাকে।

উদ্বন্ধন বা গলায় দড়ি।

অতি অল্প সময় মধ্যে উদ্বন্ধনে মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। গলদেশে রজ্জু প্রদান করিয়া একবার ঝুলিয়া পড়িলে আর জীবনের আশা থাকে না। আত্মঘাতী ব্যক্তি যে সময় ঝুলিয়া পড়ে, যদি সেই মুহূর্ত্তে কেহ তাহা দেখিতে পায় এবং সেই হতভাগ্য ব্যক্তির জীবন রক্ষার উপায় করে, তবেই প্রাণ রক্ষা হইবার সম্ভব। নতুবা তাহার জীবনের আশা করা যাইতে পারে না।

জলমগ্নের ন্যায় উদ্বন্ধনেও শ্বাস-রোধ দ্বারা মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। কোন ব্যক্তিকে উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিতে দেখিলে ক্ষণমাত্র সময় নষ্ট না করিয়া তৎক্ষণাৎ প্রতিকার চেষ্টা করা উচিত। গলায় দড়ি দিবামাত্রই মৃত্যু হয় না। সুতরাং কাহাকে গলায় দড়ি দিয়া ঝুলিতে দেখিলেই ছুটিয়া গিয়া তাহাকে উঁচু করিয়া ধরা আবশ্যক। উঁচু করিয়া ধরিয়া তুলিলে বন্ধন রজ্জু শিথিল অর্থাৎ ঢিলা হইয়া পড়িবে। অনন্তর রজ্জু কাটিয়া তাহাকে নামাইতে হইবে। নামাইয়া অবিলম্বে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, শ্বাস-রোধই উদ্বন্ধনে মৃত্যুর একমাত্র কারণ। সুতরাং শ্বাস-রোধ-জনিত রোগীর চিকিৎসা সম্বন্ধে যেরূপ ব্যবস্থা, উদ্বন্ধনেও সেইরূপ চিকিৎসা করা আবশ্যক। অতএব বন্ধন রজ্জু ছেদন করিয়া রোগীকে চীৎ করাইয়া শয়ন করাইতে হইবে। শয়ন করাইয়া জল-মগ্ন ব্যক্তির চিকিৎসায় যেরূপ কৃত্রিম প্রক্রিয়া দ্বারা শ্বাস প্রশ্বাস সঞ্চার করা হইয়া থাকে, ইহাতেও সেইরূপ করা আবশ্যক। শ্বাস প্রশ্বাস সঞ্চারিত হইলেই আর কোন প্রকার আশঙ্কা থাকে না।

উদ্বন্ধনে মৃত ব্যক্তির শোচনীয় অবস্থা দর্শন করিলে পাষাণও গলিয়া যায়। কোল জিহ্বা, লম্বিত দেহ এবং মুখের বিকৃত ভাব যার-পর-নাই দুঃখ-জনক।

অহিফেণ সেবনে আত্মহত্যা।

মানব জীবনের উদ্দেশ্য অতি মহৎ; ঈশ্বর এই মহদুদ্দেশ্য সাধন করিতে আমাদিগকে জীবন প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু বলপূর্ব্বক সেই জীবন নষ্ট করা ঘোরতর মহাপাপী ভিন্ন আর কেহই করিতে পারে না। অনেক সময় দেখিতে পাওয়া যায়, কোন কোন হতভাগ্য নরনারী অহিফেণাদি বিষাক্ত পদার্থ সেবন দ্বারা অমূল্য জীবন হারাইয়া থাকে।

আফিঙ যদিও নানাপ্রকার রোগে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, কিন্তু মাত্রার ইতর বিশেষ হইলে তদ্দ্বারা জীবন নষ্ট হয়। এজন্য চিকিৎসকের উপদেশানুসারে রোগ বিশেষে উহা ব্যবহৃত করা কর্ত্তব্য। প্রকৃতি ভেদে আফিঙের গুণাগুণ লক্ষিত হইয়া থাকে অর্থাৎ যে পরিমিত আফিঙ সেবন করিয়া এক ব্যক্তি সুস্থ থাকিতে পারে সেই পরিমিত অহিফেণ সেবনে অন্য ব্যক্তির জীবন নষ্ট হইতে পারে। পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তি অপেক্ষা শিশুর পক্ষে স্বল্প পরিমিত আফিঙে শীঘ্র মত্ততা উৎপাদন করিয়া তুলে। যে সকল ব্যক্তি কোন প্রকার মাদক দ্রব্য সেবন করে না, অল্পমাত্রায় আফিঙ সেবন করিলেই তাহাদিগের মত্ততা জন্মাইয়া থাকে। ফলতঃ রোগ ব্যতীত ইচ্ছা করিয়া অহিফেণ সেবন করা নিতান্ত মুর্খের কার্য্য। অনেক প্রকার দ্রব্যের এরূপ গুণ ও শক্তি যে, তদ্দ্বারা অসুস্থ দেহ সুস্থ করিয়া থাকে কিন্তু সুস্থাবস্থায় ব্যবহার করিলে অসুস্থের

সময় তত উপকার লাভ করিতে পারা যায় না। এজন্য প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়, যে সকল রোগে অহিফেণ ঔষধ মধ্যে গণ্য, নিত্য অহিফেণ সেবনকারীর সেই সকল রোগ হইলে তাহাদিগকে মাত্রার পরিমাণ বৃদ্ধি না করিয়া দিলে উপকার দর্শে না। এই সকল কারণে সুস্থ শরীরে অহিফেণ সেবন করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

এদেশের অনেক কুলকামিনীগণ নানা কারণে সময় সময় অহিফেণ সেবন দ্বারা জীবন নষ্ট করিয়া থাকেন। তাঁহারা লোক লজ্জা কিম্বা ক্রোধাদির হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে গিয়া আপনাকে ঘোর নরক-কুণ্ডে নিক্ষেপ করিতে কুণ্ঠিত হয়েন না। পার্থিব নিন্দা অপেক্ষা নরক যন্ত্রণা যে, ভয়ঙ্কর ব্যাপার ইহা মনে থাকিলে কোনও হতভাগ্য মানব ইচ্ছা করিয়া জীবন নষ্ট করিতে পারে না।

অনেক গৃহস্থ গৃহে কোন না কোন ব্যক্তিকে অহিফেণ সেবন করিতে দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপ সখের অহিফেণ সেবন হইতেও সময় সময় বিষময় ফল ফলিয়া থাকে। অর্থাৎ তাঁহারা সকল সময় সাবধানতার সহিত উহা না রাখিয়া যদৃচ্ছা-রূপ ফেলিয়া রাখেন; অবোধ শিশুরা খাদ্য বিবেচনা করিয়া স্বচ্ছন্দে তাহা সেবন করিয়া ফেলে। এইরূপেও অনেক অস্ফুটন্ত কোরক শিশুগণ অকালে জীবন হারাইয়া থাকে। তাহারা জানে না যে, তাহাদিগের স্নেহময় পিতা প্রভৃতি আশ্রয়-দাতাগণ তাহাদিগের জন্য কি সর্ব্বনাশের দ্রব্য গৃহে সংগ্রহ করিয়া

রাখিয়াছেন। যাহারা আফিঙ জলে গুলিয়া খাইয়া থাকে, তাহাদিগকে ঐ গোলা আফিঙ আরও সাবধানে রাখা কর্ত্তব্য। কারণ গোলা আফিঙ সেবন করিলে উহা শীঘ্র রক্তে সঞ্চারিত হইয়া জীবন নাশের সহায়তা করিয়া থাকে। ফলতঃ গৃহস্থ গৃহে অতি সাবধানতার সহিত আফিঙ রাখা আবশ্যক।

কখন কখন এরূপও দেখা যায়, নিত্য অহিফেণসেবী এক-কালে অধিক পরিমাণে আফিঙ সংগ্রহ করিয়া রাখেন। ইহা দ্বারা এই অনিষ্ট হয় যে, সেই পরিবারস্থ কোন ব্যক্তি কোন কারণে আত্মহত্যার চেষ্টা করিলে সে সেই সময় গৃহস্থিত অহি-ফেণ অপহরণ করিয়া অভীষ্ট সিদ্ধি করিয়া ফেলে। কিন্তু গৃহে ঐরূপ সুবিধা না থাকিলে হয় তো ঐ হতভাগ্য ব্যক্তি উহা সহজে না পাইয়া মৃত্যু-মুখ হইতে রক্ষা পাইতে পারিত। বিশেষতঃ কুলকামিনীরা সহজে অহিফেণ সংগ্রহ করিতে সমর্থা হয়েন না। সুতরাং গৃহে ঐরূপ সংগৃহীত অহিফেণ তাঁহাদিগের মহা অনিষ্ট করিয়া থাকে। এই সকল কারণে অহিফেণের ব্যবহার অতি সাবধানে করা আবশ্যক। যদ্দ্বারা মৃত্যু আনয়ন করিয়া থাকে, তাহা গৃহ হইতে যত দূরে থাকে তাহাই প্রার্থনীয়।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, মাত্রার আধিক্য হই-লেই আফিঙ প্রাণনাশক হইয়া উঠে। অধিক পরিমাণে অহি-ফেণ সেবন করিলে তাহা বিষাক্ত হইয়া থাকে। বিষাক্ত হইলেই মৃত্যু উপস্থিত হয়। কখন্ যে কোন্ পরিবার মধ্যে

এই সর্ব্বনাশ সংঘটিত হইবে তাহার কিছুই স্থিরতা নাই। এজন্য প্রত্যেক পরিবারেরই উচিত, অহিফেণ ঘটিত বিষ নিবারণের উপায় শিখিয়া রাখা। কারণ অনেক সময় দেখা যায় দূরবর্ত্তী স্থান হইতে চিকিৎসক আনয়ন করিবার অবসর লাভ করিতে পায়া যায় না। চিকিৎসক আসিতে আসিতেই রোগী মৃত্যু-মুখে পতিত হইয়া থাকে।

অতিরিক্ত আফিঙ সেবন করিলে কতকগুলি লক্ষণ দ্বারা তাহা জানিতে পারা যায়। সুতরাং সেই সকল লক্ষণ দেখিবামাত্র কাল বিলম্ব না করিয়া তাহার চিকিৎসা করা একান্ত আবশ্যক।

লক্ষণ।—তন্দ্রা, মাথা ঘোরা, মাথা ঢলে পড়া, অজ্ঞানতা, চোকের তারা সঙ্কুচিত অর্থাৎ ছোট হয়, অধিক মাত্রায় সেবন করিলে তারা শূঁচের অগ্র ভাগের ন্যায় ছোট হইয়া থাকে; অত্যন্ত চীৎকার করিয়া ডাকিলে যদিও উত্তর দেয়, কিন্তু পুনর্ব্বার অজ্ঞান হইয়া পড়ে; নাড়ীর বেগ দ্রুত ও ক্ষীণ হয়, গা গরম হয়, ঘন ঘন শ্বাস প্রশ্বাস বহিতে থাকে, ঘর্ম্ম হয়, এই সকল লক্ষণের পরই একেকালে অজ্ঞান হয়, শ্বাস ক্ষীণ হয়, শরীর শীতল হয়, নাড়ীর তেজ কমিয়া আইসে, তারা এক্‌কালে ছোট হইয়া যায়, রোগী এক্‌কালে ঘোর নিদ্রায় বিভোর হইয়া পড়ে। এই সময় চিকিৎসা না করিলে এই নিদ্রা অনন্ত নিদ্রার সহিত যোগ হইয়া থাকে। অহিফেণসেবীর মুখ শুঁকিলে আফিঙের গন্ধ জানিতে পারা যায়। সুতরাং তৎক্ষণাৎ চিকিৎসা করা আবশ্যক।

চিকিৎসা।—যে মুহূর্ত্তে জানিতে পারা যাইবে, অহিফেণ সেবন দ্বারা পূর্ব্বোক্ত লক্ষণসমূহ অথবা তন্মধ্যে দুই একটী লক্ষণ দেখা যাইতেছে, সেই সময় হইতেই চিকিৎসার ব্যবস্থা না করিলে জীবন রক্ষা করা কঠিন হইয়া উঠে। অহিফেণ সেবন-জনিত মৃত্যু হইতে রক্ষা করিবার পক্ষে বমনই একমাত্র মহৌষধ, ইহা যেন প্রত্যেক ব্যক্তির জ্ঞান থাকে। এজন্য যে সকল উপায়ে বমি হয়, তাহার চেষ্টা করা আবশ্যক। দেশী পুরাতন কাগজ পোড়াইয়া সেই ছাই জলে গুলিয়া রোগীকে সেবন করাইলে তৎক্ষণাৎ বমি হইয়া থাকে। অহিফেণসেবীর বমনের সহিত আফিঙের টুক্‌রা দেখিতে পাওয়া যায়। এজন্য যতক্ষণ পর্য্যন্ত ঐরূপ আফিঙ দেখা যাইবে, ততক্ষণ ক্রমাগত বমন করান প্রয়োজন। যখন দেখা যাইবে বমনের সহিত আফিঙের কোন চিহ্ন দেখা যাইতেছে না, কেবলমাত্র জল উঠিতেছে, তখন আর বমনের প্রয়োজন হয় না।

রোগীর গলার ভিতর আঙুল পূরিয়া বমি করাইবার চেষ্টা করিলে তৎক্ষণাৎ বমি হইতে পারে। পাখীর পালক আল্‌-টাক্‌রায় নাড়িলে বমি হইবার খুব সম্ভব। রাইসরিষার গুঁড়া অথবা লবণ গরম জলে গুলিয়া সেবন করাইলে বমি হইতে পারে। একবার বমি হইলে পুনর্ব্বার গরম জল পেট পূরিয়া পান করাইয়া বমন করাইবে, ইহাতে কোন ভয়ের সম্ভব থাকে না। কুড়ি গ্রেণ সল্‌ফেট্ অব জিঙ্ক* অল্প জলে গুলিয়া

* ডাক্তারখানায় পাওয়া যায়।

খাওয়াইয়া তাহার পর পেট পূরিয়া গরম জল সেবন করাইবে, বমন হইবে এবং একবার বমন হইলে পুনর্ব্বার পেট পূরিয়া গরম জল সেবন করাইবে। এইরূপে বার বার গরম জল সেবন দ্বারা বমন করাইলে মৃত্যুর আশঙ্কা থাকে না।

লিখিত উপায় সমূহ দ্বারা বারম্বার বমন করায় যখন দেখা যাইবে পেট হইতে খালি জল উঠিতেছে, তখন আর বমন করাইবার প্রয়োজন নাই মনে করিতে হইবে। রোগীকে কোন ক্রমেই ঘুমাইতে দেওয়া উচিত নহে। দুই ব্যক্তি তাহার দুই হাত ধরিয়া ভ্রমণ করাইবে। সর্ব্বদা হাত নাড়া দিয়া চেতন রাখিবে। যখন দেখা যাইবে, এই সকল উপায়েও ঘুমাইতেছে, তখন বেত্রাঘাত দ্বারা নিদ্রা ভঙ্গ করিবে। ফলং কথা যে কোন প্রকারেই হউক তাহাকে ঘুমাইতে দেওয়া অনুচিত।

বমনাদির পর রোগীকে গরম গরম চা কিম্বা কাফি পান করাইলে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে। অর্থাৎ আফিঙের বিষাক্ত দোষ নষ্ট করিয়া দেয়।

অহিফেণ ঘটিত বিষাক্ত দোষ নিবারণ করিতে যে সকল উপায় লিখিত হইল, তদ্‌সমুদয় অতি সহজ, এমন কি স্ত্রী-লোকেরা পর্য্যন্তও অনায়াসে চিকিৎসা করিতে পারেন। এস্থলে আর একটী কথা মনে রাখা আবশ্যক, অর্থাৎ লিখিত নিয়মে উপকার লাভ না হইলে রোগীর জীবনে হতাশ না হইয়া উপযুক্ত চিকিৎসক দ্বারা চিকিৎসা করাইবার ব্যবস্থা

করা আবশ্যক। কারণ এখন এরূপ চিকিৎসা প্রকাশ হইয়াছে যে, অহিফেণ সেবনে মৃতকল্প ব্যক্তিদিগকেও মৃত্যু-গ্রাস হইতে রক্ষা করা হইতেছে। তবে প্রথমে যদি সহজ উপায়ে নিবারণ হয়, পরে রোগীর জীবনে কোন আশঙ্কা থাকে না।

দূষিত খাদ্য নিরূপণ।

খাদ্য যে শারীরিক স্বাস্থ্যের প্রধান উপযোগী, সে কথার আন্দোলন সুসভ্য সমাজে নিষ্প্রয়োজনীয়। আহারীয় দ্রব্যে পুষ্টি-কর পদার্থের সংযোগ যেরূপ আবশ্যকীয় তাহাতে দূষিত পদার্থ না থাকা তদপেক্ষা সহস্র গুণে প্রয়োজনীয়। খাদ্য যত পুষ্টি-কর উপকরণেই প্রস্তুত হউক না কেন, যদি তাহাতে কোনরূপে অণু পরিমাণেও দূষিত পদার্থের সংযোগ থাকে, তবে তদ্দ্বারা খাদ্যের সমুদয় গুণ বিনষ্ট হয় এবং দেহের বিলক্ষণ অপকার ঘটিয়া থাকে। আমাদের দেশে সাধারণতঃ খাদ্যের সুস্বাদ করণে যতদূর কৌশল ও যত্ন নিয়োজিত হয়, তাহার উপকরণের পুষ্টিকারিতা ও পরিষ্কার সম্বন্ধে ততদূর মনোযোগ দেওয়া হয় না। সুতরাং আমাদের দেশের প্রায় অধিকাংশ খাদ্য সুস্বাদু হইয়াও সাতিশয় অপকারী। দেশীয় পিষ্টক এবং মিষ্টান্ন যে সকল উপকরণে প্রস্তুত হইয়া থাকে তাহার অধি-কাংশই অহিত-কর। আমাদের দেশে অসাময়িক মৃত্যু, দৈহিক দৌর্ব্বল্য এবং নানাবিধ রোগের প্রধান কারণ এইরূপ দূষিত

খাদ্যের ব্যবহার। এই সমুদায় হৃদয়-বিদারক অনিষ্টাপাত নিবারণের একমাত্র প্রধান উপায় খাদ্য পদার্থের প্রতি সবিশেষ মনোযোগ রাখা। বিশেষতঃ ওলাউঠা প্রভৃতি ভয়ঙ্কর সংক্রামক পীড়ার আবির্ভাব কালে খাদ্যের প্রতি সবিশেষ দৃষ্টি প্রয়োগ যে, কতদূর প্রয়োজনীয় তাহা বলিয়া উঠা যায় না। কতিপয় প্রধান চিকিৎসক নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, দূষিত খাদ্যেই অনেক সময়ে এই ভয়ঙ্কর রোগের কারণ হইয়া উঠে, অথবা ইহার বিশেষ সহায়তা করে।

খাদ্যের সবিশেষ দোষ নির্দ্ধারণ করিবার ক্ষমতা দ্রব্য-গুণ-তত্ত্বজ্ঞ ব্যতীত সাধারণ লোকের থাকা অসম্ভব। কিন্তু বাজারের সাধারণতঃ এমন অনেক জিনিষ দূষিত উপাদানে প্রস্তুত হয় যে, সংসারী ব্যক্তি তাহা অনায়াসেই চিনিয়া লইতে পারেন। হালুইকারের দোকানের অনেক খাদ্য অধিক ভারী করিবার জন্য বা অতিরিক্ত পরিমাণে সুস্বাদু করিবার নিমিত্ত যে উপাদান নিয়োজিত হয় তাহা প্রায়ই অপকারী। সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির নিমিত্তও এরূপ স্থলে অনাবশ্যকীয় অহিত-কর পদার্থ প্রয়োগে খাদ্যকে দূষিত করা হয়। আজি কালি আমাদের দেশীয় অনেক সহরে সন্দেশ, মিঠাই প্রভৃতি দেশীয় খাদ্যে, সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত রাংতা আবরণ প্রদত্ত হয়। ইহাতে খাদ্য দ্রব্য সাতিশয় দূষিত হয়। সেরূপ জিনিষ কোন মতেই ব্যবহার করা উচিত নহে। বরং এরূপ রীতি যাহাতে নিবারিত হয়, তাহার উপায়

বিধান করা সকল ভদ্র ব্যক্তির কর্ত্তব্য। মিষ্ট দ্রব্যের সৌন্দর্য্য করণার্থে বা রঙের উৎকর্ষ সাধন জন্য সচরাচর দূষিত উপাদানের প্রয়োগ হইয়া থাকে। গৃহস্থমাত্রেরই এইরূপ খাদ্যের চাকচিক্যের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখা দরকার। এরূপ খাদ্য ব্যবহারের ফল অনেক সময় হাতে হাতে পাওয়া যায় না সত্য। কিন্তু সেই অবশ্যম্ভাবী কুফল অজ্ঞাতসারে আমাদের স্বাস্থ্যের মূল ছেদন করে এবং চরমে ধ্বংসের কারণ হয়। এদেশে ঘৃত, দুগ্ধ, চিনি, ময়দা প্রভৃতি অপর ভোজ্য দ্রব্যে সচরাচর যে সকল দূষিত উপাদান প্রয়োগ করা হয়, অনেক সময় তাহা চিনিয়া উঠা যায় না। কোন কোন স্থলে দূরবীক্ষণের সাহায্যে যদিও চিনিয়া লওয়া যায় সত্য কিন্তু সে ব্যবস্থা অতি অল্প লোকের মধ্যেই খাটে। সুতরাং ক্রেতাকে সে অবস্থায় নিজের অভিজ্ঞতা বা কৌশলের উপর নির্ভর করিতে হয়। এরূপ স্থলে একটু বিশ্বাস্য নমুনা লইয়া তাহার সহিত ক্রীত দ্রব্যের তুলনা দ্বারা বিশেষরূপে (নিজের সাধ্য মত) তন্ন তন্ন করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখাই প্রশস্ত।

দোকানের মিষ্ট দ্রব্য সচরাচর বিনা আবরণে খোলা স্থানে সজ্জিত থাকে। তাহাতে বাহিরে কত ধূলা, পোকা, ছাই, ভস্ম যে আসিয়া পড়ে, তাহা যিনি ক্ষণকালের নিমিত্ত নিজ নয়ন ও রসনা সার্থক করিবার মানসে সেই দোকানের সম্মুখে দাঁড়াইয়াছেন তিনিই জ্ঞাত আছেন। এরূপ খাদ্য

আবার বিসূচিকা ও বসন্তের রস-পায়ী মক্ষিকাগণ সময়ে সময়ে ঐ সকল রোগের বীজ ছড়াইয়া যায়। তদুপরি মক্ষিকাগণ খাদ্য দ্রব্যের মধ্যে সচরাচর নিজ নিজ অণ্ড নিক্ষেপ করিতেও ত্রুটি করে না। খাদ্যের সহিত ঐ অণ্ড উদরস্থ হইয়া এক প্রকার ক্রিমির উৎপাদন করে। সেই ক্রিমি স্বাস্থ্যের পক্ষে বিলক্ষণ অহিত-কর। এই সমস্ত নানা কারণে বাজারের খাদ্য দ্রব্য ব্যবহার করা অপেক্ষা নিজ নিজ গৃহে খাদ্য দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া লইলে তাহা স্বল্প ব্যয়ে অধিকতর স্বাস্থ্য-কর হয়।

বাজারে সচরাচর যে মাংস বিক্রীত হয় তাহা বিশেষ পরীক্ষা না করিয়া ব্যবহার করাও অনুচিত। কারণ মাংস-ব্যবসায়ীগণ প্রায়ই শস্তা মূল্যে পাঁটা আদি ভোক্ষ্য জীব ক্রয় করিয়া থাকে। সে সকল জীব অনেক সময় বসন্ত প্রভৃতি পীড়াক্রান্ত বা শৃগাল কুক্কুর দষ্ট হইতে পারে। সেইরূপ জীবের মাংস যে, স্বাস্থ্যের পক্ষে অতীব হানি-জনক তাহা বলা বাহুল্য। এই নিমিত্তই হিন্দু-শাস্ত্রকারেরা পূজায় বিনা বলিতে অর্থাৎ বৃথা মাংস ভক্ষণ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। আর পূজায় পাঁটা প্রভৃতি যে সকল জীব বলিদান করা যায়, তাহা ঐরূপ দূষিত হইলে চলে না। পূর্ব্বোক্ত প্রকারের দূষিত এবং বাসী মাংস প্রায়ই রস-বিহীন ও বিশুষ্ক- বোধ হয়। দোকানদারেরা কোন্ কোন স্থলে ক্রেতার চক্ষে ধূলি দিবার নিমিত্তও বাসী মাংসের সহিত তাজা মাংসের

ভাজ দিয়াও থাকে, বিশেষ লক্ষ্য করিলে পূর্ব্বোক্ত লক্ষণ দ্বারা উহা নির্ব্বাচন করিতে পারা যায়।

গৃহস্থগণ অন্য ভাবেও অনেক সময়ে স্বহস্তে বিষ ভক্ষণ করিয়া থাকেন; আমরা অনেক সময় এরূপও দেখিয়াছি, কোন কোন গৃহস্থ খাদ্য দ্রব্যের প্রতি মায়া বশতঃ অতিরিক্ত খাদ্য দ্রব্য গৃহে গৃহীত বা প্রস্তুত হইলে উহা এককালে ব্যবহার করিতে না পারিয়া বাসী করিয়া আহার করিয়া থাকেন। সামান্য খাদ্যের মায়াতে যে, জীবনের মায়া পরিত্যাগ করা কতদূর মূর্খতার কাজ তাহা বুদ্ধিমান গৃহস্থমাত্রেই বুঝিতে পারেন। যে কোন প্রকার খাদ্যই হউক না কেন, তদ্দ্বারা যখন স্বাস্থ্যের অণুমাত্র অপকারের সম্ভব দেখা যাইবে, তখন তাহা বিষ-তুল্য পরিত্যাগ করাই কর্ত্তব্য।

জীবনোপায় খাদ্য সমূহ বিষ সংযুক্ত হইলে আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রকারদিগের মত অনুসারে যেরূপ লক্ষণাক্রান্ত হয়, তাহাও নিম্নে সংক্ষেপে লিখিত হইতেছে।* গৃহস্থবর্গের সে সকল কথা সর্ব্বক্ষণ স্মরণ থাকা প্রয়োজন।

অন্ন বিষাক্ত হইলে বিলেপীর মত গাঢ় হয়। তখন উহার কেণ গালা কঠিন হয়; এবং সিদ্ধ হইতে অনেক সময় লাগে। এরূপ লক্ষণাক্রান্ত অন্ন হইলে ময়ূরের গলার ন্যায় এক রকম আভা বাহির হইতে থাকে; উহা দেখিতে বাসী ভাতের মত বোধ হয়। ঐ আভা গায়ে লাগিলে

* বাগভট।

মূৰ্চ্ছা হইতে পারে এবং মুখ দিয়া লালা বাহির হয়। বিষাক্ত হইলে ভাতের স্বাভাবিক গন্ধ এবং রঙ্ থাকে না, তখন উহা কাদার মত হইয়া যায়।

বিষ সংযুক্ত অন্ন আগুণে ফেলিয়া দিলে গোলাকার হইয়া জ্বলিতে থাকে ও তাহা হইতে চট্‌চটে শব্দ বাহির হয় এবং কোন কোন সময়ে অগ্নির আদৌ শিখা থাকে না; আর কখন কখন অগ্নি হইতে ধূম নির্গত হয় এবং কখন কখন তাহা হইতে ময়ূর কণ্ঠের ন্যায় নানা বর্ণ সংযুক্ত আভা প্রকাশিত হইতে থাকে। বিষাক্ত অন্ন এইরূপে পরীক্ষা করা বিশদ এবং প্রশস্ত।

দাইল এবং অন্যান্য তরকারী বিষাক্ত হইলে ত্বরায় শুষ্ক হয় এবং তাহার ঝোল ময়লা হইয়া যায়। সেই সকল তরকারীতে কম বা বেশী অঙ্গ সংযুক্ত প্রতিমূর্ত্তি দেখা যায় এবং কখনও বা তাহা আদৌ দেখা যায় না। আর তাহাতে ফেণা এবং বুড়বুড়ি নির্গত হইতে থাকে। শাক এবং মাংস বিষাক্ত হইলে ছিন্ন ভিন্ন এবং রস-হীন অনুভূত হয়।

মাংসের যূষ বিষাক্ত হইলে তাহাতে নীল বর্ণের রেখা দেখা যায়। দুগ্ধ বিষাক্ত হইলে তাহাতে তাম্র রঙের দাগ দেখা যায়। বিষ সংযুক্ত হইলে দধিতে শ্যাম বর্ণের রেখা, ক্রমে হলুদ এবং কাল রঙের রেখা, ঘৃতে জলের ন্যায় রেখা, মদ্য ও জলে কাল রঙের রেখা এবং মধুতে বিষ মিশ্রিত হইলে হরিদ্বর্ণের রেখা, তৈলে বিষ সংলগ্ন হইলে স্বর্ণ রঙের

রেখা দেখা যায়। কাঁচা ফল বিষাক্ত হইলে পাকিয়া উঠে ও পাকা ফল বিষাক্ত হইলে পচিয়া যায়।

জীব জন্তুকে খাওয়াইয়া বিষাক্ত পদার্থ নিরূপণ করিতে পারা যায়। বিষাক্ত ভাত খাইলে মাছি মরিয়া যায়, কাকের স্বর ভাঙ্গিয়া আইসে, বিড়াল ব্যাকুল হইয়া বেড়ায়।

মনুষ্যের মুখে বিষ লাগিলে লালা পড়িতে থাকে, জিহ্বা এবং ঠোঁঠ জড়াইয়া আইসে, দাহ এবং ঝিম্ ঝিম্ ব্যথা হয়, দন্ত বিশীর্ণ হয়, জিহ্বা কোনরূপ তার পায় না এবং চোয়াল লাগিয়া আইসে।

এরূপ অবস্থা হইলে তৎক্ষণাৎ বিজ্ঞ চিকিৎসকের আশ্রয় লওয়া কর্ত্তব্য এবং বিষ-নাশক ঔষধ যত সত্বর পাওয়া যায় তত শীঘ্র সেবন করা উচিত।

মহামারির সময় সাবধানতা।

ওলাউঠা যে প্রকার ভয়ানক রোগ সে পরিচয় কাহাকেও দিতে হয় না। প্রকৃত ওলাউঠার উপযুক্ত ঔষধ এ পর্য্যন্ত প্রকাশ হয় নাই বলিলেই হয়। কি কারণে এই ব্যাধি দেশ মধ্যে সঞ্চারিত হইয়া থাকে, এ পর্য্যন্ত তাহারও সঠীক কারণ নির্দ্দিষ্টও হয় নাই, এ সম্বন্ধে চিকিৎসকদিগের মধ্যে নানা

প্রকার মত দেখিতে পাওয়া যায়। সে যাহা হউক স্বাস্থ্য রক্ষা সম্বন্ধে বিশেষরূপ সাবধানতা অবলম্বন করিলে যে, এই ভয়ানক রোগের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাওয়া যায়, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

অন্যান্য সময় অপেক্ষা যে সময় পল্লী মধ্যে এই রোগ প্রকাশ হয়, সেই সময় বিশেষরূপে সতর্ক হওয়া আবশ্যক। রোগীর মল মূত্রাদি যে জলাশয়ে ধৌত করা হইয়া থাকে, সে জলাশয়ের জল আদৌ পান করা উচিত নহে। কারণ জলাশয়ে ঐ সকল ময়লা পতিত হইলে, জলে ওলাউঠার বীজ পতিত হয় এবং সেই জল পানাদি করিলে নিশ্চয় ওলাউঠা হইবার সম্ভব। এজন্য কোন জলাশয়ে রোগীর মল মুত্রাদি সংযুক্ত বস্ত্র প্রভৃতি ধৌত করা সম্পূর্ণ অবৈধ। অনেক সময় এরূপ দেখা যায়, পল্লী মধ্যে কোন ব্যক্তির এই রোগ হইলে এবং তাহার বস্ত্রাদি যে জলাশয়ে ধৌত করা হয়, সেই জলপান করিয়া অবশেষে পল্লী মধ্যে রোগ বিস্তার হইয়া পড়িয়া থাকে। এইরূপ বিস্তারে পরিশেষে দেশ মধ্যে মহামারি উপস্থিত হয়। অতএব বিশেষরূপ সাবধান হওয়া আবশ্যক।

ওলাউঠা রোগীর মল মুত্র পুতিয়া ফেলা অতীব কর্ত্তব্য। জলাশয়ে ধৌত করা কোন মতে উচিত নহে। পানীয় জল বিশোধিত করিয়া লইলে ভাল হয়।

যে নদী বা পুষ্করিণীতে মলাদি নিক্ষিপ্ত হয়, তাহার জলপান করা কথনই উচিত নহে। এতদ্ব্যতীত পল্লীগ্রামে যে সকল

জলাশয়ে পাট কিম্বা বাখারি প্রভৃতি পচাইয়া থাকে, সেই সকল জলাশয়ের জল পান করা বিপজ্জনক তাহাও মনে রাখা উচিত। যে সকল নদীতে অধিক পরিমাণে নৌকাদি যাতায়াত হইয়া থাকে, তাহারও জল দূষিত হয়, অতএব তাদৃশ জলাশয়ের জল শোধন করিয়া ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

জলের ন্যায় বায়ুরও বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে সতর্ক হওয়া আবশ্যক। দূষিত জলে যেমন নানা প্রকার পীড়া জন্মে, সেইরূপ দূষিত বায়ুও নানা প্রকার রোগের মূল তাহাও যেন মনে থাকে। অনেক সময় দেখা যায় নানা প্রকার দ্রব্যাদি পচিয়া তাহা হইতে এক প্রকার দূষিত বিষাক্ত বাষ্প উদ্গত হইয়া দেশ মধ্যে মহামারি সঞ্চার করিয়া তুলে। অতএব বায়ু যাহাতে নির্ম্মল থাকে সর্ব্বতোভাবে তাহার ব্যবস্থা করা আবশ্যক। আবাস বাটীর চতুর্দ্দিক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিলে দূষিত বাষ্প উত্থিত হইতে পারে না। আবর্জ্জনাদি দূরে পুতিয়া ফেলিলে এই অনিষ্টের হাত হইতে অনেকটা পরিত্রাণ লাভ করা যাইতে পারে। মল মূত্রাদি হইতে যাহাতে কোন প্রকার দূষিত বাষ্প সঞ্চার হইতে না পারে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হয়। পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে, ওলাউঠা আক্রান্ত রোগীর মল মূত্র কোন জলাশয়ে ধৌত করা উচিত নহে। উহা ধৌত না করিয়া মলাদি মাটী চাপা দেওয়া আবশ্যক এবং বস্ত্রাদি সাবান বা ক্ষারে সিদ্ধ করিয়া কাচিয়া লওয়া কর্ত্তব্য। আবাস বাটীর যে সকল স্থানে ময়লা পতিত হইয়া কিম্বা জমিয়া থাকে, তথায় কার্ব্বলিক

পাউডার মধ্যে মধ্যে ছড়াইয়া দিলে অনেকটা উপকার হয়। এই পাউডার ডাক্তারখানায় ও বেনের দোকানে বিক্রয় হইয়া থাকে, দামও প্রতি সের তিন চারি আনার অধিক নহে। প্রতিদিন প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে গৃহে অর্দ্ধেক গন্ধক ও অর্দ্ধেক ধূনার গুঁড়া পোড়ান ভাল। আমাদের দেশে গ্রহ শান্তি জন্য যে, হোমবিধি প্রচলিত আছে, তদ্দারাও বিস্তর উপকার হইয়া থাকে। বিশুদ্ধ গব্য ঘৃত দগ্ধ করিলে তাহা হইতে যে এক প্রকার সৌগন্ধ নির্গত হইয়া থাকে, তাহা দুর্গন্ধ-নাশক।

ওলাউঠার সময় রাত্রিকালে যে স্থানে শয়ন করা যায়, তাহার সম্মুখের দ্বারাদি খুলিয়া রাখা উচিত নহে। সচরাচর প্রায় দেখা যায় ফাল্গুন মাসের শেষ হইতে বৈশাখ পর্য্যন্ত ওলাউঠার প্রবল সঞ্চার হইয়া থাকে, এজন্য প্রায়ই দেখা যায় অনেকেই শয়নের সময় গ্রীষ্মাতিশয্য বশতঃ জানালাদি খুলিয়া শয়ন করিয়া থাকেন, তাঁহারা মনে করেন একটু শীতল হইলেই উহা বন্ধ করিয়া দিবেন। কিন্তু অবশেষে নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়েন, সুতরাং ইহার ফল এই হয় যে, বাহিরের শীতল বাতাস লাগিয়া শরীর এত ঠাণ্ডা করিয়া তুলে যে, দেহের আভ্যন্তরিক তাপ ঘুচিয়া গিয়া অত্যন্ত শীতল হইয়া পড়ে; তাহাতে সহজেই ওলাউঠা রোগ আক্রমণ করিয়া থাকে। অনেকেই লক্ষ্য করিয়া দেখিবেন যে, অধিকাংশ ব্যক্তিরই ওলাউঠা প্রায় রাত্রির শেষে হইয়া থাকে। ওলাউঠা সঞ্চারে রাত্রিকালে নিদ্রিতাবস্থায় বাহিরের শীতল বাতাস লাগাইলে

যে, কি ভয়ানক বিপদের সম্ভব তাহা এখন গৃহস্থগণ বেশ বুঝিতে পারিলেন।

যে বাতাস আমাদের জীবন স্বরূপ, যাহার অভাবে আমরা কোনক্রমেই জীবন ধারণ করিতে পারি না, সেই বাতাস আবার দূষিত হইলে আমাদের জীবন নাশের কারণ হইয়া উঠে। অতএব বায়ুর বিশুদ্ধিতা রক্ষা করিবার জন্য কোন প্রকার আবর্জ্জনা সঞ্চয় করিয়া রাখা উচিত নহে। জল দূষিত হইবার যেমন নানাবিধ কারণ প্রদর্শিত হইয়াছে, সেইরূপ অনেকগুলি কারণে বায়ুও বিদূষিত হইয়া উঠে।

(১) আবাস বাটীর চতুর্দ্দিক অপরিষ্কার থাকিলে বায়ু দূষিত হইয়া থাকে।

(২) আর্দ্র অর্থাৎ স্যাঁৎসেঁতে স্থানে বাস করিলে তথা হইতে এক প্রকার সজল বায়ু উত্থিত হয়, তাহা স্বাস্থ্যের পক্ষে মহা অনিষ্টকারী।

(৩) এক গৃহে অধিক লোক শয়ন করিলে পরস্পরের শ্বাস প্রশ্বাসে বায়ু বিষাক্ত হইয়া উঠে।

(৪) গৃহের দ্বারাদি পরস্পর ঋজু না থাকিলে সুন্দররূপ বায়ু সঞ্চার হইতে পারে না, সুতরাং বদ্ধ বাতাস ক্রমে দূষিত হইয়া থাকে।

(৫) রাত্রিকালে বৃক্ষতলে শয়ন করিলে এক প্রকার বিষাক্ত বায়ু শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া অনিষ্ট করিয়া তুলে।

(৬) যে ঘরে রোগী থাকে, তথাকার বাতাসও খারাপ হইয়া থাকে।

(৭) যে গৃহে সর্ব্বদা আগুণ থাকে, তথাকার বায়ুও অস্বাস্থ্য-কর।

উপরে যে সাতটী মোটামুটি কারণ দেখান গেল, তদ্ভিন্ন আরও অনেক কারণে বায়ু বিদূষিত হইয়া থাকে। বিদূষিত বায়ু যে, ওলাউঠা প্রভৃতি বহুবিধ মারাত্মক রোগ আনয়ন করিয়া থাকে, তাহা যেন প্রত্যেক গৃহস্থের মনে থাকে।

যে গৃহে ওলাউঠার রোগী থাকে, তথায় এক ঝুড়ি কাঠের কয়লা রাখিলে বায়ু বিশোধিত হয়। রোগীর মল, মূত্র এবং শ্বাস প্রশ্বাসে যাহাতে বায়ু দূষিত হইতে না পারে, সে জন্য সৌগন্ধ দ্রব্য গৃহে রাখা ভাল।

কেবল যে, জল ও বায়ুর প্রতি দৃষ্টি রাখিলেই ওলাউঠার হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারা যায় এরূপ নহে। এ সম্বন্ধে অনেক বিষয়ে দৃষ্টি রাখিতে হয়। যে যে বিষয়ে দৃষ্টি রাখা আবশ্যক, আমরা তাহার স্থূল স্থূল বিষয় উল্লেখ করিয়া —গৃহস্থবর্গকে সাবধান হইতে অনুরোধ করিতেছি। আহার সম্বন্ধে সাবধানতা অবলম্বন করা যে, একটী গুরুতর প্রয়োজন তাহা বোধ হয়, নিতান্ত বালকে পর্য্যন্তও বুঝিতে পারে। আহারের দোষে যে, অনেক সময় এই ভয়ানক রোগের আক্রমণে পড়িতে হয়, তাহা বোধ হয় অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। ওলাউঠা সঞ্চারের সময় কোন প্রকার গুরু-পাক দ্রব্য আহার করা উচিত নহে। যাহা সহজে পরিপাক হয়, অথচ বেশ স্বাস্থ্য-কর এরূপ দ্রব্য পরিমিত আহার করা আবশ্যক।

কদর্য্য দ্রব্য আহার করিলে যে, রোগকে ডাকিয়া আনা হয়, তাহা যেন সকলের মনে থাকে। এই সময় অধিক রাত্রে আহার করা সম্পূর্ণ অন্যায়। যে দুইবার আমরা আহার করিয়া থাকি, তাহার একটী নির্দ্দিষ্ট সময় নিরূপণ থাকা আবশ্যক।

যে সকল খাদ্য সহজে জীর্ণ হয় না এরূপ কাঁচা ফল, খেঁসারি, মটর প্রভৃতি দাইল, পচা মৎস্য এবং বাসী দুগ্ধাদি কোন মতেই খাওয়া উচিত নহে। ছাতু, কড়াই-ভাজা, চিড়া, মুড়কী, চাউল ভাজা, অথবা শিম, বরবটি, কাঁঠালের বিচি ও মটর প্রভৃতি ভাজা, নানা প্রকার পিষ্টক, নানাবিধ মিষ্ট সামগ্রী, উষ্ণ দুগ্ধ, কিম্বা আধ সিদ্ধ দাইল, চর্ব্বিযুক্ত মৎস্য বা মাংস, শাক, বিলাতী-কুমড়া, কাঁচা কিম্বা আধ-পাকা ফল, কাঁঠাল, আতা প্রভৃতি যাহা আহার করিলে পেটের অসুখ হইবার সম্ভব; তৎ-সমুদায় একেবারে আহার নিষেধ। পানীয় দ্রব্যের মধ্যে মদ, তপ্ত চা বা কাফি পান নিষেধ, এমন কি পরিষ্কার জলও অধিক পরিমাণে পান করিলে উদরের অসুখ জন্মায়। লোনা, পচা, মড়া বা সুকানা মৎস্য মাংসও অজীর্ণ-কর এবং পরিত্যাজ্য।

এই সময় অতিরিক্ত পরিশ্রম করা অবৈধ। যাহাতে শরীর দুর্ব্বল হয় এরূপ কাজ করা অত্যন্ত অনিষ্ট-কর। সুতরাং রাত্রি জাগরণ ও রমণ প্রভৃতি পরিত্যাগ করা ভাল।

যে স্থানে এই ভয়ানক রোগ দেখা দেয়, সে স্থান পরিত্যাগ করিতে পারিলেও বিশেষ উপকার।

ওলাউঠার রোগীকে যে সকল ব্যক্তি সেবা শুশ্রূষা করিয়া থাকে, তাহারা যদি খাদ্যাদি প্রস্তুত করে তবে, হস্ত পদাদি উত্তমরূপে ধৌত করিয়া তাহা করা উচিত। কারণ ওলাউঠার বীজ যেন তাহাদিগের হস্তের সহিত খাদ্যাদিতে সঞ্চার হইতে না পারে! মেলা প্রভৃতি বহু লোক-সমাগম স্থানে এই রোগ দেখা দিলেই তৎক্ষণাৎ সে স্থান পরিত্যাগ করা উচিত।

দুর্ব্বল শরীরে সহজেই নানা প্রকার রোগ আশ্রয় করিয়া থাকে, সুতরাং অতিরিক্ত শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমে যদি দেহ ভগ্ন থাকে, তবে সহজেই এই রোগ আক্রমণ করিতে পারে।

বালকদিগকে অধিক রাত্রি জাগরণ করিয়া, পাঠাভ্যাস করিতে দেওয়া উচিত নহে। যাহাতে সুনিদ্রা হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে হয়। নিদ্রার ব্যাঘাত জন্মিলে শীতল জলে হস্ত পদাদি প্রক্ষালন করতঃ শয়ন করিলে সুনিদ্রা হইতে পারে। কোন প্রকার দুশ্চিন্তা মনে উদয় হইলে তাহা পরিত্যাগ করিয়া ঈশ্বর চিন্তায় মনোনিবেশ করিলে ক্রমে ক্রমে নিদ্রা আসিয়া উপস্থিত হইবে।

ওলাউঠার সময় তীব্র বিরেচক ঔষধ লওয়া কর্ত্তব্য নহে। কোষ্ঠ পরিষ্কার না হইলে মৃদু বিরেচক জোলাপ লওয়া উচিত। সহজ অবস্থায় একবারমাত্র পাতলা বাহ্যে অথবা বমি হইলে তৎক্ষণাৎ ঔষধ সেবন করা আবশ্যক। অনেকে এইরূপ অবস্থায় তাচ্ছিল্য করিয়া পরিশেষে এই ভয়ানক ব্যাধির গ্রাসে পতিত হইয়া জীবন হারাইয়া থাকেন।

ওলাউঠা-সঞ্চারে কোনমতেই ভয় পাওয়া উচিত নহে। ভয় করিলে লাভের মধ্যে এই হয় যে, যদিও রোগ হইতে বিলম্ব থাকে, তবে তাহাকে যত্ন করিয়া ডাকিয়া আনা হয়। ভয় যে ওলাউঠা রোগের একটী কারণ তাহা যেন মনে থাকে। অতএব মনে সাহস থাকা আবশ্যক। সর্ব্বদা আমোদ-জনক বিষয়ে মনোনিবেশ রাখিতে হয়।

ওলাউঠা অতি ভয়ানক রোগ; অতএব উহার আক্রমণ হইতে এক মুহূর্ত্ত সময়ও অপব্যয় না করিয়া প্রথম হইতেই সুচিকিৎসকের দ্বারা চিকিৎসার ব্যবস্থা করা আবশ্যক। আমাদের বিবেচনায় প্রত্যেক পরিবারেই এই রোগের মোটামুটি চিকিৎসা জানিয়া রাখা গুরুতর কর্ত্তব্য। ওলাউঠা সঞ্চারে সাবধানতা সম্বন্ধে যে সকল বিষয় লিখিত হইল, এক্ষণে তাহার স্থূল স্থূল জ্ঞাতব্য নিয়ম কয়টী উল্লেখ করিয়া আমরা এ প্রস্তাব শেষ করিব।

(ক) শরীর, কাপড়, ঘর, বিছানা প্রভৃতি সর্ব্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিবে।

(খ) নূতন চাউলের কিম্বা পান্তাভাত, অত্যন্ত শীতল অথবা অত্যন্ত গরম জিনিস, কাঁচা বা পচা ফল, পচা, শুক্‌টে, বা তেলাল মাছ, অথবা চর্ব্বি ওয়ালা মাংস, তেলে ভাজা দ্রব্য, পিয়াজ, রসুন, বিলাতী বা মিঠা কুমড়া প্রভৃতি তরকারী এবং যাহা সহজে জীর্ণ হয় না এরূপ গুরু-পাক দ্রব্য আহার করিবে না।

(গ) নিয়মিত পুষ্টি-কর দ্রব্য আহার করিবে।

(ঘ) শীতল জলে স্নান করিবে। অধিকক্ষণ জলে থাকিবে না।

(ঙ) খারাপ জলে স্নান অথবা সেই জল পান করিবে না।

(চ) অনিয়মিত পরিশ্রম, কিম্বা দুশ্চিন্তা না করিয়া সর্ব্বদা শান্তভাবে থাকিবে।

(ছ) অধিক রাত্রি জাগরণ, অনিয়মিত রমণ কিম্বা সুরা প্রভৃতি মাদক দ্রব্য সেবন করিবে না।

(জ) এক ঘরে অধিক লোক বাস করা কিম্বা নিদ্রা যাওয়া উচিত নহে।

(ঝ) শরীরে অধিক হিম লাগাইবে না।

(ঞ) কোন স্থানে মহামারি আরম্ভ হইলে যত শীঘ্র পার সে স্থান ত্যাগ করিবে।

(ট) রোগীর মল মূত্রাদি সংযুক্ত বস্ত্রাদি চব্বিশ ঘণ্টার অধিকক্ষণ না রাখিয়া পুড়াইয়া ফেলিবে। মল ও বমি মাটি চাপা দিবে।

(ঠ) একবার পাতলা বাহ্যে বা বমি হইলেই সতর্ক হইবে।

(ড) প্রতিদিন প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে ঘরে গন্ধক ও ধুনা পুড়াইবে।

(ঢ) সর্ব্বদা কর্পূরের ঘ্রাণ লইবে।

চলিষ্ণু যানাদি হইতে দুর্ঘটনা।

প্রায় দেখা যায় গমন-শীল যানাদি হইতে অবতরণ কালে অনেকেই বিপদাপন্ন হইয়া থাকেন আরোহণ ও অবতরণ নিয়ম অবগত না হওয়াই যে, ঐ বিপদের মূল কারণ তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

পূর্ব্বাপেক্ষা আজি কালি দেশ মধ্যে যানাদির ব্যবহার বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি হইয়াছে। রেলওয়ে, ট্রামওয়ে, অশ্বযান এবং জল-যান প্রভৃতির যেরূপ প্রচলন হইতেছে, পূর্ব্বে এরূপ ছিলনা। প্রতিদিন অসংখ্য স্ত্রী, পুরুষ, বালক, বালিকা, বৃদ্ধ, বৃদ্ধা এবং পীড়িত ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন যানাদিতে গমনাগমন করিয়া থাকে। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমরা প্রায়ই শুনিতে পাই নানা প্রকার দুর্ঘটনা-বশতঃ আরোহীদিগের মধ্যে কাহার কাহারও হস্ত পদাদি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে এবং কাহার কাহারও বা সংসারলীলা শেষ হইয়াছে।

কোন কোন সময় দেখা যায় আরোহীগণ ব্যস্ততাবশতঃ সহসা বিপদে পতিত হইয়া থাকে। বিশেষতঃ কোন প্রকার পর্ব্বা-হাদি উপস্থিত হইলে জনতা মধ্যে অধিক পরিমাণে দুর্ঘটনা ঘটিতে দেখা যায়। যে কোন প্রকার যানে আরোহণকালে অতি সাবধানতা পূর্ব্বক আরোহণ ও অবতরণ করা উচিত। বিশেষতঃ বালক, বালিকা, বৃদ্ধ, বৃদ্ধা এবং পীড়িত ব্যক্তিদিগকে অত্যন্ত সাবধানতার সহিত আরোহণ ও অবতরণ করাইতে হয়।

রেলওয়ে যাত্রিদিগের মধ্যে প্রায়ই দেখা যায়, অনেকেই প্রবেশ পথের পার্শ্বে উপবেশন করিতে ইচ্ছা করিয়া থাকেন; বিশেষতঃ বালক বালিকাদিগের ত কথায় নাই। এই সকল আরোহীদিগের মধ্যে কখন কখন দেখা যায় কেহ কেহ কবাটের পার্শ্বে হাত রাখিয়া অন্যমনস্ক হইয়া থাকে। রেলের খালাসিগণ হটাৎ কবাট বন্ধ করায় হস্তে গুরুতর আঘাত লাগিয়া থাকে। এজন্য কবাটের পার্শ্বে হাত রাখা উচিত নহে।

রেলওয়ে আরোহীদিগের মধ্যে অনেকেরই চোকে কয়লার কুচি পড়িয়া থাকে। চক্ষু অতি কোমল পদার্থ অল্পেই নষ্ট হইতে পারে। কয়লার কুচি কঠিন এবং সূক্ষ্ম। উহা চক্ষে পড়িবামাত্রেই অনেকে চোক চাকিয়া থাকে। চাকিলে যে, উহা চক্ষে বিদ্ধ হইয়া গুরুতর অনিষ্ট করিতে পারে, অনেকেরই সে জ্ঞান থাকে না। চক্ষে কয়লার গুঁড়া পড়িলে অপর ব্যক্তি দ্বারা সাবধানতার সহিত তাহা তুলিয়া ফেলা আবশ্যক। অথবা চোক্ষের নীচের পাতা উপরিকার পাতার নিম্নে ঢুকাইয়া দিলেও উহা আপনা হইতে বাহির হইতে পারে। এতদ্ভিন্ন চক্ষু উন্মীলন পূর্ব্বক জলে ডুব দেওয়া ভাল।

রেলশকটে যে দিকে এঞ্জিন্ অর্থাৎ কল থাকে, সেইদিকে পশ্চাৎ করিয়া উপবেশন করিলে চোকে কয়লার গুঁড়া পতিত হইবার আর আশঙ্কা থাকে না।

অত্যন্ত সাবধানতার সহিত রেলযাত্রা করা কর্ত্তব্য। যতক্ষণ পর্য্যন্ত শকটের বেগ থাকে ততক্ষণ আরোহণের চেষ্টা করা

উচিত নহে। আরোহণকালের ন্যায় আবার অবতরণ সময়েও সাবধান হওয়া আবশ্যক। ষ্টেশনে যে সময় শকট প্রবেশ করিতে থাকে, সে সময় তাহার পার্শ্বে (প্লাটফরমে) দণ্ডায়মান থাকা সম্পূর্ণ অন্যায়। কারণ শকটের গতিতে মাথা ঘুরিয়া পতিত হইবার গুরুতর সম্ভব। তজ্জন্য কিছু দূরে অবস্থান করা ভাল।

রেলশকটের কলের নিকটস্থ গাড়িতে উপবেশন না করিয়া কল হইতে যতদূরে আরোহণ করা যায় ততই ভাল। কারণ শকটে শকটে সংঘর্ষণ, শকট রেলচ্যুতি প্রভৃতি কোন প্রকার দুর্ঘটনা হইলে কলের নিকটবর্ত্তী যানাদিই ভগ্ন বা চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া থাকে। এজন্য দূরে থাকাই সুপরামর্শ।

কোন প্রকার গতিশীল যানাদি হইতে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক অবতরণ করা অত্যন্ত বিপদের বিষয়। তদ্বারা হস্ত পদাদি ভঙ্গের এবং কখন কখন প্রাণ নাশেরও সম্ভাবনা। ট্রাম শকটে এই দুর্ঘটনা সর্ব্বদাই ঘটিতে দেখা যায়। আরোহীগণ মনে করিয়া থাকে, ধীরে ধীরে শকট চলিতেছে, অতএব সহজেই লম্ফ প্রদান করিয়া অবতরণ করিব। কিন্তু এইরূপ অবস্থায় অবতরণ করিতে হইলে যে দিকে শকট চলিতেছে সে দিকে মুখ করিয়া নামিতে হয় এবং অবতরণ করিয়াই সম্মুখভাগে কিঞ্চিৎ দৌড়িয়া গেলে পতিত হইবার আশঙ্কা থাকে না। যে কোন চলিষ্ণু যানাদি হইতে অবতরণকালে এই নিয়মের প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত।

গর্ভবতী স্ত্রীলোকদিগের দূর রেলপথে গমনাগমন করা অবিধি; কারণ তদ্বারা গর্ভস্রাব ঘটিবার গুরুতর সম্ভাবনা।

যে কোন যানাদিতে গমনকালে বিশেষরূপ সতর্কভাবে অবস্থিতি করা বুদ্ধির কাজ। কারণ অনেক সময় দেখা যায় আরোহণ, অবতরণ, উপবেশন এবং গমনাগমন করিবার দোষেও নানা প্রকার দুর্ঘটনা সংঘটিত হইয়া থাকে।

সামান্যমাত্র অঘাতে মানব দেহ ভঙ্গ এবং জীবন বিনষ্ট হইতে পারে। অতএব যে কোন প্রকার দুর্ঘটনার পূর্ব্ব সূচনা দেখিলেই বিশেষরূপ সতর্ক হওয়া আবশ্যক। পতন-জনিত কোন প্রকার আঘাত গুরুতর হইলে তৎক্ষণাৎ সুচিকিৎসক দ্বারা চিকিৎসার ব্যবস্থা করা উচিত। আর কোন অঙ্গে আঘাত লাগিলে কিম্বা ভাঙ্গিয়া অথবা থেঁতলিয়া গেলে পূর্ব্বে চিকিৎসা সম্বন্ধে যে সকল ব্যবস্থা উল্লেখ করা হইয়াছে, সেই সকল বিধি অবলম্বন করা আবশ্যক। আঘাত প্রাপ্ত অঙ্গে ফোমেণ্টেশন অর্থাৎ সেক এবং পুল্‌টিস্ দিলে বিশেষরূপ উপকার হইয়া থাকে। অতএব সেক ও পুল্টিস্ প্রয়োগ সম্বন্ধে কিছু কিছু জ্ঞান থাকা আবশ্যক। এজন্য পুল্টিস ও ফোমেণ্টেশন সম্বন্ধে স্থূল স্থূল বৃত্তান্ত স্থানান্তরে উল্লেখ করা গেল। সামান্য আঘাতে সেক ও পুল্টিসে যে উপকার হইয়া থাকে, মূল্যবান ঔষধ দ্বারা সেরূপ হইতে দেখা যায় না।

প্রসবের পরক্ষণে সাবধানতা।

সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে সন্তান ও প্রসূতির শুশ্রূষা করাই প্রধান কার্য্য। সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলেই তাহার মুখের ভিতর যে সকল লালাবৎ পদার্থ থাকে তাহা পরিষ্কার করিয়া দিতে হয়। সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়াই যদি কাঁদিয়া উঠে, তবে কোন আশঙ্কা থাকে না। না কাঁদিলে জানিতে হইবে শিশুর শ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ রহিয়াছে। এজন্য যাহাতে শিশু কাঁদিয়া উঠে, তজ্জন্য নিম্নলিখিতরূপ চেষ্টা করা উচিত।

(ক) শিশুর চোকে মুখে শীতল জলের ছিটা দিতে হয়।

(খ) নাকের মধ্যে ফুৎকার দিতে থাকিবে।

(গ) মরিচ চিবাইয়া কাণের ভিতর হাই দিলেও শ্বাস প্রশ্বাস চলিতে পারে।

(ঘ) পাখির পালক শিশুর নাকের ভিতর ও টাক্‌রায় সুড়সুড়ি দিলেও ছেলের শ্বাস প্রশ্বাস চলিতে পারে।

(ঙ) শিশুর বুকের উপর আস্তে আস্তে একবার হাত চাপিয়া ছাড়িয়া দিবে, পুনর্ব্বার ঐরূপ করিবে।

(চ) ছেলের দুই হাত ধরিয়া একবার তাহার মাথার উপর অর্থাৎ কাণের দুই পাশে ধরিবে, পুনর্ব্বার তাহার পেটের উপর স্থাপন করিবে।

(ছ) ছেলেকে চিৎ করাইয়া শোওয়াইয়া তাহার চোখে, মুখে একবার গরম জল এবং একবার শীতল জলের ছিটা

দিবে। পরে শুক্‌না নেকড়া দিয়া জল পুঁছিয়া দিবে। এই-রূপ ক্রমাগত পাঁচ মিনিট করিলে শিশু কাঁদিয়া উঠিবে।

(জ) ছোট এক টুকরা বরফ পাথর কিম্বা ইঁটের উপর ঘসিয়া বেশ গোল করিবে, পরে তাহা শিশুর মল দ্বারে প্রবিষ্ট করিয়া দিবে। খানিক পরে পুনর্ব্বার ঐরূপ করিবে। দুই একবার এইরূপ করিলে ছেলে কাঁদিয়া উঠিবে।

(ঝ) ছেলের বুকের উপর আধ বুরুল লম্বা এবং এক চুল গভীরভাবে দুই তিন স্থানে চিরিয়া দিয়া তাহাতে তার্পিণ তৈল কিম্বা স্প্রিট্ লাগাইয়া দিলে তাহার জ্বালায় ছেলে কাঁদিয়া উঠিবে।

(ঞ) ছেলের বুকের উপর একটী জ্বলন্ত সলিতা কিম্বা অন্য কোন অগ্নি নিকট ধরিবে যেন তাহাতে চামড়ার উপর একটী মটর প্রমাণ ফোস্কা হয়; ইহার জ্বালায় ছেলে কাঁদিতে পারে। ইহাতে না কাঁদিলে ফোস্কার ছাল তুলিয়া দিয়া তাহাতে তার্পিণ তৈল কিম্বা স্প্রিট্ লাগাইয়া দিলেও কাঁদিয়া উঠিতে পারে।

ছেলে ভূমিষ্ঠ হইয়া কখন কখন দুই তিন ঘণ্টা পর্য্যন্ত কাঁদে না। অতএব তাহাতে হতাশ্বাস না হইয়া লিখিতরূপ চিকিৎসা করা উচিত।

ছেলে কাঁদিয়া উঠিলে তাহার নাড়ী কাটিবার ব্যবস্থা করা আবশ্যক। শিশুর নাড়ির উপর চারি আঙুল আন্দাজ রাখিয়া রেশম কিম্বা অন্য কোন প্রকার মোটা সূতা দ্বারা বাঁধিবে। আর যদি ফুল না পড়ে তবে ঐ বন্ধনের দুই আঙুল উপরে

ঐরূপ আর একটী বন্ধন দিবে, এখন এই উভয় বন্ধনের মধ্য-স্থলে কাটিয়া দিবে।

শিশু ভূমিষ্ঠ হইয়া কাঁদিয়া উঠিলে গৃহস্থকে আর ব্যতিব্যস্ত হইতে হইবে না। তখন হয় তৈল মাখাইয়া কিম্বা সাবান দিয়া গরম জলে তাহার সর্ব্ব শরীর উত্তমরূপে ধৌত করিয়া দিবে। পরে শুক্না নেকড়া দিয়া বেশ করিয়া পুঁছিয়া গরম কাপড় দ্বারা গা ঢাকিয়া কাহার কোলে দিবে।

শিশুর শ্বাস প্রশ্বাস সঞ্চালিত করা, তাহার সর্ব্বাঙ্গ পরিষ্কার করা এবং নাড়ী কাটা যেমন প্রধান কাজ; সেইরূপ প্রসূতির শুশ্রূষা করাও আবার আর একটী গুরুতর কার্য্য মধ্যে পরিগণিত।

ধাত্রীর দেখা উচিত সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়া ফুল পড়িয়াছে কি না। সহজ প্রসবে প্রায় এক ঘণ্টার মধ্যেই আপনা হইতেই ফুল পড়িয়া থাকে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত ফুল না পড়িবে, ততক্ষণ পেটের উপর ধাত্রী একখানি হাত অল্প চাপিয়া ধরিবে। এই-রূপ ব্যবস্থায় অল্পক্ষণ রাখিলেই ফুল নির্গত হইবে। কিন্তু নিয়-মিত সময় অতীত হইতেছে অথচ ফুল পড়িতেছে না, এরূপ হইলে তখন এক হাতে পেট চাপিয়া রাখিয়া অপর হাতে নাড়ী ধরিয়া আস্তে আস্তে ঘুরাইয়া টানিলেই সহজে ফুল বাহির হইয়া আসিবে। যখন দেখা যাইবে এই সকল উপায়েও ফুল পড়িতেছে না, তখন প্রসব দ্বারে হস্ত প্রবিষ্ট করিয়া অতি সত-র্কতার সহিত তাহা বাহির করিতে হইবে।

অতিরিক্ত রক্তস্রাব কিম্বা প্রসূতি অত্যন্ত দুর্ব্বল হইলে কুড়ি ফোটা অর্গটের আরক অথবা উহার আট রতি গুড়া সেবন করাইয়া দিবে।

ফুল পড়িলে প্রসূতির পেট বাঁধিয়া দিবে। পেট বাঁধিয়া না দিলে পেট ঝুলিয়া পড়িয়া বড় দেখাইবে; ঝোলা বা বড় পেট দেখিতে অত্যন্ত কদর্য্য। এজন্য প্রসবের পর পেট বাঁধা আবশ্যক। ফুল পড়িবার পূর্ব্বে যেমন পেট চাপিয়া রাখা হইয়াছে, এখন একখানি কাপড় দিয়া পেটের উপর একটী গাইট দাও। পরে দেড় কিম্বা সাত পোয়া বহরের তিন হাত লম্বা থান লম্বালম্বী ভাঁজ বা পাট করিয়া মাজার নিচে হইতে ঘুরাইয়া দুই মুখ পেটের উপর আন। এখন এই দুই মুখ উপরি উপরি রাখিয়া আল্‌পিণ দ্বারা আঁটিয়া দিলেই পেট বাঁধা হইল।

এই সকল কার্য্য শেষ করিয়া সন্তানকে স্তন পান করাইতে অভ্যাস করাইবে। প্রসবের পর শিশু স্তন পান করিলে তিনটী উপকার হইয়া থাকে। প্রথমতঃ সেই দুগ্ধ শিশুর পক্ষে জোলাপের কার্য্য করে। অর্থাৎ উহা পান করিলে তাহার পেটের সঞ্চিত মল নির্গত হইয়া থাকে। দ্বিতীয়তঃ প্রসূতির অতিরিক্ত রক্তস্রাব হয় না। তৃতীয়তঃ স্তনে ডেলা ডেলা শক্ত অবস্থা কিম্বা ফোড়া প্রভৃতি রোগ হইতে পারে না।

শিশুর পেটে একপ্রকার কাল মল সঞ্চিত থাকে, তাহা চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে নির্গত না হইলে এরণ্ড তৈল অর্থাৎ ক্যাষ্টর অয়েল খাওয়াইবে; শিশুর প্রস্রাব না হইলে কড়ে আঙুলে

এরণ্ড কিম্বা সরিষার তৈল মাখাইয়া তাহার মল দ্বারে প্রবেশ করাইয়া দিলেই তাহার বাহ্যে ও প্রস্রাব হইয়া থাকে। কখন কখন এরূপও দেখা যায়, ছেলের তলপেটে পালক কিম্বা চুল দ্বারা সুড়সুড়ি দিলেও প্রস্রাব হইয়া থাকে।

সন্তান ভূমিষ্ঠের পর স্তন দুগ্ধই তাহার প্রধান আহার। স্তন পান না করিলে গাভী দুগ্ধ পান না করাইলে কোন ক্ষতি হয় না। মধ্যে মধ্যে একটু একটু মধু খাওয়াইলেই চলিতে পারে। কাহার কাহার মতে প্রসবের পর দুই দিন পর্য্যন্ত দুগ্ধ পান না করাইলেও শিশুর কোন অপকার হয় না। যদি গো-দুগ্ধ পান করাইতে হয়, তবে খাঁটি দুগ্ধ এক ভাগ এবং তিন ভাগ জল মিশাইয়া তাহাতে একটু মিষ্ট দিয়া অল্প গরম করিয়া তাহাকে পান করাইবে। এই দুগ্ধ স্তনদুগ্ধের ন্যায় সমান গুণবিশিষ্ট। দুগ্ধে জল মিশাইলে সর্দ্দি লাগিবার কোন আশঙ্কা করা উচিত নহে। খাঁটি দুগ্ধ পান করিলে শিশু পরিপাক করিতে পারিবে না, লাভের মধ্যে পেটের পীড়া হইয়া মৃত্যু উপস্থিত হইতে পারে।

প্রসবের পর তিন দিন পর্য্যন্ত প্রসূতিকে দুধসাগু আহার দিবে। পরে মাছের ঝোল, মাংসের ঝোল, দুধ ভাত এবং রাত্রে রুটী ব্যবস্থা করিবে। অনেকে দুধসাগুর পরিবর্ত্তে চিড়া ভাজা প্রভৃতি আহার করিতে দেয়। কিন্তু তদ্দ্বারা পেটের পীড়া হইবার সম্ভব। অনেক বিচক্ষণ চিকিৎসকের মতে প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে দুই বেলা আধ কাঁচ্চা করিয়া এক কাঁচ্চা পোর্ট নামক মদিরিকা কিছুদিন পান করাইলে প্রসূতির কোন প্রকার

অসুখের সম্ভব থাকিবে না। প্রসূতিকে ঝাল খাওয়ানর যে রীতি আছে তদ্দ্বারা অপকার ভিন্ন উপকারের অধিক আশা নাই, সুতরাং তাহা ব্যবহার না করাই ভাল। তবে অন্নের সহিত অল্প পরিমাণে গোলমরিচের গুঁড়া এবং ঘৃত ব্যবহার করিলে ক্ষুধা বৃদ্ধি ও শরীরস্থ রস শুষ্ক হইতে পারে।

অনেকে সূতিকা ঘরে সর্ব্বদা আগুন জ্বালাইয়া রাখে। ইহা দ্বারা এই ফল দর্শে যে, গৃহস্থিত বায়ু দূষিত হইয়া সন্তান ও প্রসূতির স্বাস্থ্যের মহা অনিষ্টকর হইয়া উঠে; কখন কখন গাঢ় ধূমে সন্তানের শ্বাস রোধ হইয়া মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। স্যাঁতা ঘর হইলে যদিও ধূম-শূন্য সামান্যরূপ আগুন রাখিলে চলিতে পারে কিন্তু অট্টালিকা প্রভৃতি ভাল ঘর হইলে আগুনের কোন প্রয়োজন হয় না।

সেক তাপের জন্য আগুন ব্যবহার হইয়া থাকে। কিন্তু সেকতাপ না দিলেও বিশেষ কোন হানি নাই। আর যদি সামান্য রকম তাপ দেওয়ার আবশ্যক হয়, তবে সেই সময় আগুন রাখিয়া পরে তাহা গৃহ হইতে বাহির করিলেই কোন অনিষ্টের আশঙ্কা থাকে না।

প্রসূতির পেট বাঁধা হইলে তাহার প্রসব দ্বার উত্তমরূপে পরিষ্কার করিয়া এক খণ্ড গরম কাপড় ভাঁজ করিয়া উক্ত দ্বারের মুখে স্থাপন করিবে এবং তাহা ময়লা হইলে পুনর্ব্বার বদলাইয়া দিতে হইবে। আর প্রতিদিন প্রাতে ও মধ্যাহ্নে এবং সন্ধ্যা-কালে ফটকিরির গুঁড়া গরম জলে মিশাইয়া সেই জল দ্বারা

উত্তমরূপ ধৌত করাইবে। দশ বার দিন পর্য্যন্ত প্রসব দ্বার দিয়া এক প্রকার ক্লেদ নির্গত হইয়া থাকে। উহা বন্ধ হইলে চিকিৎসকের উপদেশানুসারে তাহার প্রতিকার করা উচিত।

কখন কখন দেখা যায়, কোন কোন প্রসূতির প্রসবদ্বার দিয়া এক প্রকার দুর্গন্ধযুক্ত মলিন রক্ত ও পূঁজ নির্গত হইয়া থাকে। এরূপ অবস্থা ঘটিলে তাহা সর্ব্বদা পরিষ্কার করিয়া দেওয়া আবশ্যক। এই সময় সকালে ও বৈকালে দুইবার করিয়া প্রসব দ্বারে পিচকারী দিলে উত্তম পরিষ্কার থাকে। এজন্য দুই ড্রাম কার্ব্বলিক এসিড, তিন পোয়া গরম জলের সঙ্গে মিশাইয়া বোতলে পুরিয়া রাখিবে এবং প্রত্যহ তাহার পিচকারী দিবে। পিচকারী দেওয়ার সময় চিৎ হইয়া প্রসূতিকে শায়িত করাইতে হয় এবং পিচকারীর * মুখ তিন আঙুল পর্য্যন্ত প্রসব দ্বারের ভিতর প্রবেশ করাইয়া চারি পাঁচ বার পিচকারী করিলেই হইল।

প্রসবের পর প্রসূতিকে নড়িয়া চড়িয়া বেড়াইতে দেওয়া উচিত নহে তদ্দ্বারা নানাবিধ অনিষ্ট হইবার সম্ভব। বিশেষতঃ প্রসূতির অঙ্গ সঞ্চালনে জরায়ু নড়িয়া চড়িয়া উৎকট পীড়া হইবার সম্ভব।

---

* হিকিন্‌স-পিচকারী এই কার্য্যে ব্যবহার হইয়া থাকে। উহার মূল্য তিন টাকা হইতে চারি টাকা পর্য্যন্ত। উহা ডাক্তারখানায় পাওয়া যায়।

প্রসবের পর তিন দিনের মধ্যে প্রসূতির বাহ্যে না হইলে মৃদু বিরেচক অর্থাৎ ক্যাষ্টর অয়েল জোলাপ দেওয়া আবশ্যক।

এই সময় হইতে প্রসূতির বিশেষ সাবধানে থাকিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। কারণ প্রসূতি পীড়িতা হইলে শিশুর পর্য্যন্তও পীড়া হইবার কথা।

ফোমেণ্টেশন ও পুল্টিস।

গৃহস্থবর্গের মধ্যে প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়, নানা প্রকার রোগে পুল্টিস ও ফোমেণ্টশন অর্থাৎ সেক দিতে হইয়া থাকে। কিন্তু পুল্টিস ও সেক কি নিয়মে দিতে হয় এবং তাহার দ্বারা কিরূপ উপকার হইয়া থাকে, অনেকেই তদ্বিষয়ে অনভিজ্ঞ। পুল্টিস ও ফোমেণ্ট দ্বারা বিস্তর উপকার হইয়া থাকে, এমন কি অনেক সময় দেখিতে পাওয়া যায়, বিনা ঔষধে কেবলমাত্র পুল্টিস ও ফোমেণ্টে বিস্তর রোগ প্রতিকার হইয়া থাকে। সুতরাং এরূপ উপকারী বিষয়ে কি পুরুষ কি স্ত্রী পরিবারস্থ প্রত্যেক ব্যক্তিরই কিছু কিছু জ্ঞান থাকা আবশ্যক।

পুল্টিস ও সেক কেবলমাত্র চর্ম্মের উপরে ব্যবহার হইয়া থাকে। চর্ম্মের উপরিভাগে অথবা নিম্নে কোন স্থানে বেদনা ফুলা এবং উত্তাপ হইলে একমাত্র পুল্টিস দ্বারা সে স্থান নরম

রাখা যায়। পুল্টিস দ্বারা শিরার রক্ত চলাচল শিথিল হয়; তজ্জন্য টনটনানি কমিয়া আইসে সুতরাং বেদনা নরম পড়ে। বেদনাযুক্ত স্থানে পুল্টিস দিলে বেদনা নিবারণ করে, পূঁয হয় না এবং তাহা বসিয়া যায়।

ফোমেণ্টেশন বা সেক দিতে হইলে যাহা সহ্য যায়, এরূপ গরম জলে সেক দেওয়াই কর্ত্তব্য। সেক দ্বারাও ফুলা ও বেদনা কমিয়া আইসে। কোন স্থানে ফোড়া প্রভৃতি রোগ হইলে যে পর্য্যন্ত পূয না বসিয়া যায়, সে পর্য্যন্ত পুল্টিস দেওয়া উচিত। পুল্টিসের দুইটী গুণ; প্রথম অবস্থায় দিলে তাহাতে ফোড়া প্রভৃতি ফুলা বসাইয়া দেয়। আর পূয হওয়ার অবস্থায় দিলে বেদনা-যুক্ত স্থানের চতুর্দ্দিকের বেদনা বা টনটনানি উপশম করে এবং পূঁয উপরে ঠেলিয়া দেয় এমন কি আপনাপনি ফাটিয়া যাইতেও পারে। কোন কোন চিকিৎসকের মতে এ অবস্থাতেও ফোমেণ্টেশন বা সেক দিতে পারা যায়।

সেক দেওয়ার ন্যায় যে গরম সহ্য হয় এইরূপ গরম অবস্থায় পুল্টিস দেওয়া উচিত। একবার পুল্টিস দিয়া অধিকক্ষণ তাহা রাখা কর্ত্তব্য নহে; কারণ অধিকক্ষণ রাখিলে তাহা ঠাণ্ডা এবং শক্ত হইয়া উঠে। এজন্য প্রত্যেক পুল্টিস দুই ঘণ্টার অধিক সময় রাখা উচিত নহে। ঘন ঘন পুল্টিস দিলে অধিক পরিমাণে উপকার হইয়া থাকে।

কি পরিমাণে পুল্টিস দিতে হয় তাহা বোধ হয় অনেকে অবগত নহেন। পুল্টিসের আকার একটু বড় করা আবশ্যক

অর্থাৎ যে পরিমিত স্থান ব্যাপিয়া বেদনা হয়, তাহা অপেক্ষা একটু অধিক স্থান লইয়া পুল্টিস দিতে হয়। কারণ তদ্দ্বারা চারিদিকের বেদনা আরাম হইয়া থাকে।

ফোড়া প্রভৃতি রোগে যত দিন তাহা পাকিয়া না উঠে, তত-দিন পুল্টিস ব্যবহার করা উচিত। আর তাহা পাকিয়া গলিতে আরম্ভ হইলে ফোড়ার মুখ অপেক্ষা কিছু বড় করিয়া পুল্টিস দিতে হইবে। কারণ গলিয়া যাওয়ার পর বড় পুল্টিস দিলে চামড়া হাজিয়া গিয়া ছোট ছোট ফুস্‌কুড়ি বাহির হইবার সম্ভব।

ফোড়া, ঘাড়মুগরা কিম্বা বিচিতে বেদনা হইলে পুল্টিস দেওয়ার পূর্ব্বে এক্‌ষ্ট্রাক্‌টা বেলেডোনা আর গ্লিসারিং * সমান ভাগে মিশাইয়া ঐ সকলের উপর লাগাইয়া তাহার উপর পুল্টিস দিলে অত্যন্ত উপকার হইয়া থাকে। অর্থাৎ শীঘ্র আরোগ্য হয়। এস্থলে একটী বক্তব্য আছে, কোন গৃহস্থ যেন এরূপ মনে না করেন উহা না লাগাইলে পুল্টিস ব্যবহার হইতে পারে না। উহার অভাবেও পুল্টিস দেওয়া যাইতে পারে, তবে উহা দ্বারা বিশেষ উপকারের কথা।

যে কোন চর্ম্ম-রোগে কোন স্থান ফুলিয়া ও লাল হইয়া উঠিলে তাহাতে পুল্টিস দিতে পারা যায়। যে স্থান ফুলিয়া উঠে, সেই স্থানে পুল্টিস দিলে কেবল যে, সে স্থান আরাম হয় এরূপ নহে, তাহার নীচের অর্থাৎ ভিতরের বেদনা পর্য্যন্তও ভাল হইয়া থাকে।

* ডাক্তার খানায় পাওয়া যায়।

রোগ বিশেষে পুল্টিসের আকার ছোট ও বড় করিতে হয়। পুল্টিস ঠাণ্ডা হইবামাত্র পরিবর্ত্তন করা উচিত। ফুসফুস সম্বন্ধীয় পীড়া অর্থাৎ কাসি, নিমোনিয়া, ব্রণকাইটিস্ প্রভৃতি রোগ এবং উদরের পীড়ায় পুল্টিস ব্যবহার করিলে বিশেষরূপ উপকার হইয়া থাকে। এই সকল পীড়ায় এরূপ নিয়মে পুল্টিস দিতে হইবে, যেন সে স্থানের উত্তপ্ত চর্ম্ম শীতল হইতে না পারে; এজন্য নূতন আর একটী পুল্টিস প্রস্তুত না করিয়া সে পুল্টিসটী বদলান উচিত নহে। একটী পুল্টিস তুলিয়া ফেলিয়া আবার যদি অধিক বিলম্বে সে স্থানে পুল্টিস ব্যবহার করা যায়, তবে পীড়িত স্থানের চামড়া ঠাণ্ডা হইতে পারে। এজন্য এবিষয়ে মনোযোগ দিতে হয়।

শিশুদিগের ফুসফুসের পীড়ায় পুল্টিস বিশেষ উপকারী। কিন্তু তাহারা বালস্বভাব সুলভ চাঞ্চল্য বশতঃ প্রায়ই অস্থির হয়। শয্যায় স্থির থাকে না, এজন্য দেখা যায় তাহারা পুল্টিস জড়াইয়া ফেলে এবং কতক বাহির হইয়া পড়ে। ইহা নিবারণ করিতে হইলে তাহাদিগের পীঠ ও বুক জুড়িয়া পুল্টিস দেওয়া উচিত। অনেক বিচক্ষণ চিকিৎসকের মতে এরূপ অবস্থায় জ্যাকেট পুল্টিস ব্যবস্থা করা সুপরামর্শ। জ্যাকেট পুল্টিস প্রস্তুত করিবার নিয়ম এস্থানে লিখিত হইতেছে। বুক ও পীঠ ঢাকিয়া যায় এরূপ এক খণ্ড বস্ত্র লইবে। এখন সেই বস্ত্রে এরূপ নিয়মে ফিতা লাগাইয়া লইবে তদ্দ্বারা যেন ঘাড়ের উপর এবং পেটের সম্মুখে বাঁধিতে পারা যায়। অর্থাৎ তিন

জোড়া ফিতা বুকের নীচে তিনটী সেলাই করিয়া তদ্দ্বারা সামনে টানিয়া বাঁধিবে।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে, গরম অবস্থাতে পুল্টিস বিশেষ উপকারী। এজন্য পুল্টিস এক ইঞ্চি পুরু করা আবশ্যক। কিন্তু অনেক সময় এরূপ পুরু পুল্টিস শিশু কিম্বা দুর্ব্বল রোগীর পক্ষে কষ্ট-কর হইয়া থাকে। এরূপ স্থলে পুল্টিস পাতলা করিয়া তাহার উপর তুলা বিছাইয়া ব্যবহার করিলে উহা শীঘ্র শীতল হইবে না এবং হাল্‌কা জন্য কোন প্রকার কষ্টেরও আশঙ্কা থাকিবে না। বক্ষস্থলে কিম্বা উদরে এইরূপ পুল্টিস বিশেষ উপকারী। এরূপ নিয়মে পুল্টিস ব্যবহার করিলে শিশুদিগের পক্ষে কোন প্রকার কষ্ট হইবে না। কোন অঙ্গের উপরে কিম্বা ভিতরে বেদনা প্রভৃতিতে এইরূপ পুল্টিস অত্যন্ত উপকারী।

বাতরোগেও পুল্টিস ব্যবহার হইয়া থাকে। বিশেষতঃ কোন অঙ্গবিশেষ অর্থাৎ হস্ত, পদ কিম্বা গাঁইটে বেদনা হইলে পুল্টিস ব্যবহারে অত্যন্ত উপকার হইয়া থাকে। কোমরের বেদনায় এমন কি তিন চারি ঘণ্টা ধরিয়া একটী পুল্টিস দিলে এক দিনেই আরোগ্য হইয়া থাকে।

পুল্টিস গরম এবং পুরু হওয়া আবশ্যক; এমন কি তিন ঘণ্টা পর্য্যন্ত যেন একটী পুল্টিস চলিতে পারে। পুল্টিস তুলিয়া ফেলা হইলে এক খণ্ড ফ্লানেল দ্বারা সেই স্থান বা অঙ্গটী ঢাকিয়া রাখা উচিত এবং ঘর্ম্ম নির্গত হইলে উপকার হইয়াছে জানিতে হইবে।

নানা প্রকার দ্রব্য দ্বারা পুল্টিস প্রস্তুত হইয়া থাকে; অর্থাৎ তিসি বা মসিনা, মসিনার খৈল, পাঁউরুটি, সুজি, যবের ভুষী প্রভৃতি উপকরণ ব্যবহার হয়। এই সকল দ্রব্যের বিশেষ গুণ এই যে, বেশ জমাট হয়, আটা বাঁধে এবং ছিদ্রযুক্ত থাকে। মসিনা ও মসিনার খৈল এবং ভুষিতে অধিকক্ষণ গরম থাকে।

যে সকল স্থানে ফুস্কুড়ি হয়, তথায় মসিনা কিম্বা খৈলের পুল্টিস লাগাইলে সামান্য জ্বালা করে; কারণ মসিনার এক প্রকার ঝাঁজ এই জ্বালা উৎপাদন করিয়া থাকে। এজন্য এরূপ স্থলে পাঁউরুটির পুল্টিস ব্যবহার করাই উত্তম। পাঁউরুটির পুল্টিস সচ্ছিদ্র এজন্য শীঘ্র ঠাণ্ডা হইয়া থাকে, কোন প্রকার জ্বালা হয় না।

যে স্থানে চামড়া অধিক নরম রাখিবার প্রয়োজন, তথায় তিসির পুল্টিস দেওয়া উচিত। সুজির পুল্টিসে শীঘ্র বেদনা আরাম করে এবং অধিকক্ষণ গরম থাকে। মসিনার পুল্টিস আটা আটা হয় এজন্য শীঘ্র ঝরিয়া পড়িয়া শয্যাদি ময়লা এবং রোগীকে অসুস্থ করে না।

যে কোন পুল্টিস প্রস্তুত করিবার সময় ফুটন্ত জল এবং অন্যান্য উপকরণগুলি হাতের নিকট থাকা চাই। আর তৎসমুদায় অল্প গরম করিয়া লওয়া উচিত।

মসিনার খৈলের পুল্টিস তৈয়ার করিতে হইলে পাত্রটী অল্প গরম করিয়া তাহাতে গরম জল ঢালিয়া দিয়া এক হাতে খৈলের গুঁড়া অপর হাতে কাটি করিয়া খুব নাড়িতে হইবে।

ইহা এত শীঘ্র প্রস্তুত করিয়া লাগাইতে হইবে যেন ঠাণ্ডা না হয় ক্ষিপ্রহস্ত ব্যক্তিই পুল্টিস প্রস্তুত করিবার উপযুক্ত। জলে গুঁড়া দিয়া গুলিয়া লইয়া জ্বালে বসান ভাল। নতুবা গুঁড়াতে জল দিলে উহা ভালরূপ না মিশিয়া দলা দলা হইয়া উঠিবে। খৈলের গুঁড়া কাদা কিম্বা কাইয়ের মত হইলে তখন তাহা নেকড়ায় মাখাইয়া চারিধার মুড়িয়া দিতে হইবে। চারিধার মুড়িয়া না দিলে উহা বাহির হইয়া রোগীর বস্ত্রাদি মলিন করিতে পারে।

নয় ভাগ মসিনার খৈল আর এক ভাগ সোরা দিয়া পুল্টিস প্রস্তুত করিয়া বাতরোগে ব্যবহার করিলে অত্যন্ত উপকার হইয়া থাকে। খৈলের অভাবে তিসি অল্প ভাজিয়া লইয়া তাহা বাটিয়া পূর্ব্বোক্ত নিয়মে পুল্টিস প্রস্তুত করিতে হইবে।

পাঁউরুটির পুল্টিস।—এই পুল্টিস দুই প্রকার নিয়মে প্রস্তুত হইয়া থাকে। প্রথম প্রকারে পুরুভাবে খণ্ড খণ্ড রুটি কাটিয়া তাহাতে গরম জল ঢালিয়া দিতে হইবে। রুটিতে জল শুষিয়া লইলে পরে তাহা পাঁচ মিনিট আগুনের উপর বসাইতে হইবে। অনন্তর পাক-পাত্রটী ঈষৎ কাইত করিয়া জল ঢালিয়া দিতে হইবে। পরে আবার তাহাতে পরিমাণ মত জল দিয়া জ্বাল দিতে থাকিবে। যে জল বাহির হইবে তাহা ফেলিয়া দিয়া কাটি দ্বারা রুটি ঘাঁটিয়া লইয়া কাদা কাদা হইলে তদ্দ্বারা পুল্টিস প্রস্তুত করিবে।

দ্বিতীয় প্রকার নিয়ম; বাসিরুটি পুরু পুরু করিয়া কাটিয়া

চাটুতে রাখিবে এবং গরম জল তাহাতে ঢালিয়া দিয়া ফুটাইয়া লইবে। অনন্তর তাহা নিংড়াইয়া চট্‌কাইয়া লইলেই পুল্টিস তৈয়ার হইল। প্রথম প্রকারে প্রস্তুত করিলে তাহা সচ্ছিদ্র হয়; দ্বিতীয় প্রকার কাই অর্থাৎ মসিনার পুল্টিসের ন্যায় হয়।

কোন্ রোগে কোন্ প্রকার পুল্টিস ব্যবহৃত হয় তাহা পরে উল্লিখিত হইবে।

গমের ভূষীর পুল্টিস হাল্‌কার জন্য ব্যবহার হইয়া থাকে।

সুজির পুল্টিসে কোন প্রকার উত্তেজনার আশঙ্কা নাই। ইহার একটী বিশেষ গুণ এই যে, ইহা অধিকক্ষণ পর্য্যন্ত গরম থাকে এই পুল্টিস প্রস্তুত করিতে হইলে ইহা শীতল জলে গুলিয়া চট্‌কাইয়া পরে তাহাতে গরম জল মিশাইয়া কাদা কাদা হইলে কাপড়ে মাখাইয়া পুল্টিস ব্যবহার করিতে হইবে।

প্রয়োগ।—চর্ম্মের উপর যে সকল ফুসকুড়ি বাহির হয়, ফুলিয়া উঠে এবং বেদনা বোধ হয়, তাহাতে সুজির পুল্টিস ব্যবহার হইয়া থাকে। ক্যান্‌সার প্রভৃতি ক্ষতরোগে এই পুল্টিস বিশেষ উপকারী।

কাষ্ঠের কয়লার খিচ-শূন্য গুঁড়া কোন কোন প্রকার পুল্টিসে ব্যবহার হইয়া থাকে। পচা ঘায়ের দুর্গন্ধ নিবারণ করিয়া স্বাভাবিক অবস্থায় আনিতে হইলে কয়লার গুঁড়া ব্যবহার হয়। এরূপ অবস্থায় সচ্ছিদ্র পুল্টিস ব্যবহার করাই সুপরামর্শ। এজন্য উক্ত গুঁড়া পাঁউরুটির পুল্টিসের সহিত

অম্ল মিশাইয়া তাহার উপরে অপেক্ষাকৃত বেশীর ভাগ ছড়াইয়া দিয়া ব্যবহার করিতে হয়। পচা দুর্গন্ধযুক্ত ঘায়ের উপরে কয়লার গুঁড়া ছড়াইয়া দিয়া তাহাতে পুল্টিস দিলে আরও উপকার হইবার কথা। এস্থলে আর একটী কথা মনে রাখা আবশ্যক, অর্থাৎ ঐরূপ রোগীর ক্ষত হইতে দুর্গন্ধ নির্গত হইলে গৃহ মধ্যে কয়লা রাখা আরও ভাল।

কয়লার অভাবে পোড়া রুটি দ্বারা পুল্টিস প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করিলে পচা ভাল হইয়া থাকে।

বজ্রাঘাত।

বজ্রাঘাতে প্রাণের আশা থাকে না। এত অল্প সময়ের মধ্যে বজ্র পতিত হয় যে, সাবধানতা অবলম্বন করা যাইতে পারে না। কিন্তু পূর্ব্বে সাবধান হইলে এই আকস্মিক বিপদ হইতে রক্ষা পাওয়া যাইতে পারে।

যে বজ্রাগ্নিতে সমুদায় পদার্থ দগ্ধ ও জীবন বিনষ্ট হইয়া থাকে তাহাকে তড়িতাগ্নি কহে। এই তাড়িত পদার্থ সমুদায় দ্রব্যে অল্পাধিক পরিমাণে বর্ত্তমান আছে। মেঘমণ্ডলে যে তাড়িত বিদ্যমান আছে তাহাই পৃথিবীতে পতিত হইলে তাহাকে বজ্র কহিয়া থাকে। তাড়িতের একটী সাধারণ গুণ এই যে, উহা

এক পদার্থ হইতে অন্য পদার্থে সঞ্চারিত হইতে দেখা যায়। এই কারণ বশতঃ এক খণ্ড মেঘ হইতে অপর মেঘখণ্ডে সঞ্চারিত হইয়া থাকে। এই সঞ্চরণে যে জ্যোতি নির্গত হয় তাহাই বিদ্যুৎ এবং যে শব্দ শ্রুত হয় সেই শব্দকে বজ্রধ্বনি কহিয়া থাকে। বিদ্যুৎ ও বজ্রধ্বনি তাড়িত পদার্থ হইতেই উৎপন্ন হয়।

মেঘ হইতে যেমন মেঘান্তরে তাড়িত পদার্থ সঞ্চারিত হইয়া থাকে, সেইরূপ সময় সময় পৃথিবীতেও সঞ্চারিত হইতে দেখা যায়। যে শক্তি বা ধর্ম্ম অনুসারে এক পদার্থ হইতে অন্য পদার্থে তাড়িত সঞ্চারিত হয় তাহার নাম তাড়িতাকর্ষণ। যে সময় পৃথিবীতে বজ্র পতিত হয়, সে সময় নিকটবর্ত্তী পদার্থে পড়িয়া থাকে। সমতল ক্ষেত্র অপেক্ষা অট্টালিকা ও বৃক্ষাদিতে অধিক পরিমাণে বজ্রাঘাত হইতে দেখা যায়। এজন্য মেঘ-গর্জ্জন ও বিদ্যুৎ সঞ্চার হইতে আরম্ভ হইলে বৃক্ষের তলায় আশ্রয় লওয়া উচিত নহে। কারণ বজ্রের এরূপ নিয়ম যে, নিক-টবর্ত্তী পদার্থ সমূহের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ জিনিসের উপরই পতিত হইয়া থাকে। এই জন্যই বৃক্ষতলস্থ অনেক ব্যক্তির বজ্রাঘাতে মৃত্যু হইতে দেখা যায়। বৃক্ষতলায় আশ্রয় গ্রহণ করা অপেক্ষা সমতল ক্ষেত্রে অবস্থিতি করা ভাল।

লৌহ প্রভৃতি ধাতব পদার্থের সহিতও তাড়িতের অতি ঘনিষ্ট আকর্ষণ সম্বন্ধ। এই কারণবশতঃ মেঘগর্জ্জনকালে স্ত্রীলোকেরা কোন ধাতুপাত্র বাহিরে রাখে না। লোহার ছাতা এবং অন্য কোন প্রকার ধাতুঘটিত দ্রব্য মেঘগর্জ্জন সময় ব্যবহার করিয়া

গৃহের বাহিরে যাওয়া সুপরামর্শ নহে। গৃহমধ্যে অবস্থিতি-কালে আবার গৃহ প্রাচীর বা দেওয়াল ঠেস দিয়া অবস্থান করা বিপদের বিষয়। কারণ অট্টালিকাদিতে বজ্রপাত হইলে প্রায়ই দেওয়ালের উপর পড়িয়া থাকে। বজ্রাঘাত হইতে রক্ষা পাই-বার জন্য অট্টালিকায় এক প্রকার লৌহনির্ম্মিত শিক ব্যবহার হইয়া থাকে। অট্টালিকার এক কোণে ছাদ অপেক্ষা কিছু উচ্চ একটী শিক মৃত্তিকা পর্য্যন্ত সংযুক্ত থাকিলে অট্টালিকায় বজ্রপাত-জনিত বিপদের আশঙ্কা থাকে না। কারণ তাড়িতা-কর্ষণে বজ্র ঐ শিকে পতিত হইয়া ভূগর্ভে পরিচালিত হইয়া থাকে। সুতরাং তদ্দারা কোন প্রকার বিপদ ঘটে না।

বজ্রপতনকালে অর্থাৎ যে সময় মেঘগর্জ্জন ও বিদ্যুৎ হইতে থাকে, তৎকালে বিশেষরূপ সাবধান হওয়া আবশ্যক। নিকটে বজ্র পতিত হইলে অনেকে এককালে অভিভূত হইয়া পড়েন। কোন প্রকার সংজ্ঞা থাকে না। এরূপ ঘটনা হইলে অবিলম্বে সেবা শুশ্রূষা দ্বারা জীবন রক্ষা করা উচিত।

সম্পূর্ণ।